সাহিত্য দীপালী

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য
নং T.B./74/VI/TB/8/dated 24.11.75

সাহিত্য দিপালী

[ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

কালিদাস রায়, কবিশেখর
সম্পাদিত

ভারত পাবলিশার্স
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১৩নং কলেজ রো ঃ কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
বি. ভট্টাচার্য
ভারত পাবলিশার্স
১৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ—নভেম্বর, ১৯৭৩
অষ্টম সংস্করণ—ডিসেম্বর, ১৯৮৩

দাম : টা ৩·৫০

[ভারত সরকার প্রদত্ত সুলভ মূল্যের কাগজে মুদ্রিত]

মুদ্রাকর ঃ
রবীন্দ্রনাথ সরকার
সেনগুপ্তরী প্রেস
২১ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

[গদ্যাংশ]

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠাংক
১। আলোর রথের সারথি	কালিদাস রায়	১
২। ভক্ত কবীর	অমিয়কুমার সেন	৪
৩। ব্যা	সুকুমার রায়	৮
৪। আচার্য জগদীশচন্দ্র	কালিদাস রায়	১১
৫। ধর্ম ও বিজ্ঞান	ক্ষিতিমোহন সেন	১৬
৬। নৌশেরার যুদ্ধ	যাযাবর	১৯
৭। হিমালয়ের পথে	প্রবোধকুমার সান্যাল	২৩
৮। স্বদেশ-ভক্ত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৭
৯। উশীনরের উপাখ্যান	কালিদাস রায়	৩০
১০। এডওয়ার্ড জেনারের আবিষ্কার	চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য	৩৩
১১। বাঙালী মহাজ্ঞানী	কালিদাস রায়	৩৮
১২। অজানা দেশের সন্ধানে	জয়দেব রায়	৪১

[পদ্যাংশ]

কবিতার নাম	লেখক	পৃষ্ঠাংক
১। দশরথের উপদেশ	কৃত্তিবাস ওঝা	১
২। বিদ্যাসাগর	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৩
৩। আমার সোনার বাংলা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪
৪। বঙ্গভাষা	অতুলপ্রসাদ সেন	৬
৫। বাংলা দেশ	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৮
৬। দেখব এবার জগৎটাকে	কাজী নজরুল ইসলাম	১০
৭। হাত গণনা	সুকুমার রায়	১২
৮। পূজার দিনে	কালিদাস রায়	১৪
৯। ছাত্র সঙ্গীত	ঐ	১৬
১০। আমার বাড়ী	কুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৭
১১। সবার আমি ছাত্র	সুনির্মল বসু	১৯
১২। জাতীয় পতাকা	মনোজিৎ বসু	২১
১৩। নকলগড়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৩

আলোর রথের সারথি



কালিদাস রায়

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের আগুন তখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে বাংলার ঘরে ঘরে। গোটা বাংলাদেশ ডুবে রয়েছে শোচনীয় দারিদ্র্যের অন্ধকারে। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই—ঘরে ঘরে কেবল হাহাকার। তার ওপর রয়েছে বহুদিনের জমে থাকা কু-আচার ও কু-সংস্কার, যার চাপে পড়ে বঙ্গসমাজ একেবারেই পঙ্গু হতে চলেছে। জাতির সামনে বিরাট জমাটবাঁধা অন্ধকার। কোথাও কোন আলোর রেশ পর্যন্ত নেই। ঠিক এই ঘোর দুর্দিনে আবির্ভূত হ'লেন এক অমিত শক্তিসম্পন্ন পুরুষ, যিনি পরিষ্কার করলেন বহু বছরের জমে থাকা কু-সংস্কারের আবর্জনা, সন্ধান দিলেন নতুন দিনের আলোর, বাঙ্গালী জাতিকে দিলেন মুক্তির সন্ধান।

এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ কে জানো? রাজা রামমোহন রায়—আমাদের নতুন দিনের সূর্য, আমাদের নতুন আলোর সারথি। প্রভাত আলোর রথ চালিয়ে তিনিই আমাদের পথ দেখালেন।

রামমোহনের জন্ম হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত ও ধনী ছিলেন। মাতা তারিণী দেবী ছিলেন প্রখর জ্ঞানসম্পন্না মহিলা। শৈশবে রামমোহনের শিক্ষা শুরু হয় গুরুমশাই-এর পাঠশালায়। তাঁর অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সকলে আশ্চর্য হয়ে যেত। অল্প বয়সে রামমোহন পারসী, সংস্কৃত, আরবী ও ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেন। এ ছাড়া ঐ বয়সেই তিনি সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে নানা বই লিখতে আরম্ভ করেন। এই ধর্ম ও

সমাজ-চিন্তাই তাঁকে পরবর্তী কালে বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের কাজে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

তখনকার দিনে যে সমস্ত কু-সংস্কারের চাপে পড়ে বঙ্গসমাজ পঙ্গু হয়ে পড়েছিল, তার মধ্যে সতীদাহ ছিল সব চেয়ে পৈশাচিক। সমাজপতিরা এই বলে বিধান দিতেন যে, মৃত স্বামীর চিতায় স্ত্রী আত্মাহুতি দিলে সেই স্ত্রী সমাজের কাছে সতী বলে চিহ্নিত হবে এবং পরকালে স্বামীর সঙ্গে সাড়ে তিন কোটী বৎসর ধরে স্বর্গসুখ ভোগ করতে পারবে। স্বামীর মৃত্যু হলে প্রথমে শোকাকুলা সদ্যবিধবাকে পায়ে আলতা, সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হ'ত। পরে তাকে একরকম জোর করেই স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হত শোকাকুলা বিধবার প্রাণ রক্ষার আকুতিকে। ধর্মের নামে, সতীত্বের নামে দীর্ঘদিন এই নারকীয় নারীহত্যা সমাজে চলেছিল।

এই বর্বরোচিত কু-সংস্কারও কেবলমাত্র বাঙ্গলাদেশেই যে প্রচলিত ছিল তা' নয়, ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলেও এই নারকীয় প্রথার প্রচলন দেখা গিয়েছিল। রাজা রামমোহন প্রায় একক প্রচেষ্টায় এই বর্বর কু-সংস্কার রোধ করেন।

ধর্মের গোঁড়ামি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নিত্য কলহ দেখে রামমোহন অন্তরে গভীর ব্যথা অনুভব করতেন। অদূর ভবিষ্যতে এ সকল সাম্প্রদায়িক কলহ ও ধর্মের গোঁড়ামিই যে বঙ্গসমাজকে একেবারে পঙ্গু করে দেবে, এ সত্য তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি প্রচার করতে লাগলেন একেশ্বরবাদ—স্থাপন করলেন ব্রাহ্মসমাজ। এই ব্রাহ্ম-সমাজই একদিন বাঙ্গলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক হয়েছিল। রামমোহন প্রবর্তিত একেশ্বরবাদের মধ্যে সকল ধর্মের সারই নিহিত ছিল। বাংলা সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রেও রামমোহন অভূতপূর্ব সংস্কার সাধন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাংলা গদ্যের মার্জিত রূপ দিয়েছিলেন। এ ছাড়া নারী-শিক্ষার প্রবর্তন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, বহুবিবাহ উচ্ছেদ, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ প্রভৃতি অগণিত সংস্কার সাধন রামমোহনের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

এই সকল সংস্কার সাধন করতে রামমোহনকে সারা জীবন অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। এই কঠোর পরিশ্রমের ফলে ধীরে ধীরে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। অবশেষে ১৮৩৩ সালে ইংলণ্ডের কাছাকাছি ব্রিষ্টল শহরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

* অনুশীলনী

১। (ক) রামমোহনের জন্মস্থান কোথায় ?
   (খ) রামমোহনের পিতা ও মাতার নাম কি ?
   (গ) তাঁহার বাল্যশিক্ষা শুরু হয় কোথায় ?
   (ঘ) কোথায় রামমোহন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ?

২। 'সতীদাহ' প্রথা বলিতে কী বুঝ সংক্ষেপে লিখ।

৩। রামমোহন কি কি সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৪। পদ পরিবর্তন কর ঃ নারকীয়, পৈশাচিক, ধর্মীয়, অমানুষিক।

It narrates briefly the main achievement of Rammohan Roy the torch bearer of nineteenth century Bengal renaissance. It speaks commendably against soc evil like 'burning of the Sati'.

ভক্ত কবীর



অমিয়কুমার সেন

আমাদের এই ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকে বহু বিদেশীর আগমন হয়েছে। তাঁদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও ধর্মবিশ্বাস ভারতবাসীদের থেকে আলাদা ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ তাঁদের বিদেশী বলে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলে, দূরে সরিয়ে রাখেনি। ধীরে ধীরে তাঁরাও ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিও ভারতীয় বলে গণ্য হয়েছে। তাঁদের ধর্মবিশ্বাস তাঁরা রক্ষা করতে পেরেছেন। তাঁদের জীবনযাত্রার প্রণালীও বিসর্জন দিতে হয়নি। পরকে আপন করার এই প্রতিভা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছে।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঝে মাঝে বিরোধ ঘটেনি তা নয়, কিন্তু যারা এই বিরোধকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে তারা ভারতবাসীর কাছে সম্মান পায়নি। যাঁরা এই বিরোধের মধ্য থেকে ঐক্যের সন্ধান পেয়েছেন, সে মহাপুরুষদেরই ভারতবাসী বিশেষভাবে সমাদর করেছে। ভক্ত কবীর এই মহাপুরুষদের অন্যতম।

এখন থেকে পাঁচশো বছরেরও বিছু আগে, আনুমানিক ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কবীরের জন্ম। তাঁর পিতামাতা মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁতী ছিলেন। তাঁদের আটপৌরে নাম জোলা। তাঁরা কাশীতে বাস করতেন।

অল্প বয়স থেকে কবীর নিজেদের জাত ব্যবসাই করতেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু তাঁর মনে ভগবানের প্রতি ভক্তি অতি বাল্যকালেই জাগ্রত হয়েছিল। তখনকার দিনে রামানন্দ নামে এক মহাপুরুষ

কাশীতে বাস করতেন। তিনি হিন্দুধর্মের যাগযজ্ঞ এবং আচার-অনুষ্ঠান বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মত ছিল যে ভক্তির সাহায্যেই মানুষ ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে, জাঁকজমক করে তাঁর পূজা করার প্রয়োজন নেই। কবীর রামানন্দের মতকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর মনে রামানন্দকে গুরু বলে গ্রহণ করার ইচ্ছা হল। কিন্তু রামানন্দ হিন্দু, তিনি যদি মুসলমানকে শিষ্য করতে না চান এই কথা ভেবে কবীর একটি উপায় বের করলেন। রামানন্দ রোজ সকালে যে পথে গঙ্গাস্নান করতে যান সে পথের উপর কবীর একদিন শুয়ে রইলেন। রামানন্দ যখন গঙ্গাস্নান করে ফিরছিলেন তখনো ভালো করে আলো ফোটেনি। রামানন্দের পা কবীরের গায়ে লেগে গেল। তিনি সংকোচে "রাম রাম" বলে উঠলেন। কবীর ভাবলেন, রামানন্দ তাঁকে "রাম" মন্ত্র দিয়ে নিজের শিষ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি হিন্দু এবং মুসলমান উভয় ধর্মের মূল নীতিগুলো প্রচার করতে লাগলেন। তিনি বলতেন, ভগবান বা আল্লা মন্দিরেও নেই মসজিদেও নেই, মানুষের মনের মধ্যেই আছেন। তিনি বলতেন, সাধুলোককে হিন্দু বা মুসলমান বলে চিহ্নিত করার দরকার নেই। সাধু সাধুই। তাঁর অন্য কোন ধর্ম বা জাত নেই।

ধর্মের এই সরল ব্যাখ্যা শুনে বহু লোক কবীরকে গুরু বলে স্বীকার করেন। যাঁরা কবীরের মতকে বিশ্বাস করেন তাঁদের নাম হল কবীরপন্থী। আজও ভারতবর্ষে বহু কবীরপন্থী আছেন।

সাধারণের উপযোগী সরল হিন্দী ভাষায় তিনি তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে গান রচনা করে সকলের মধ্যে প্রচার করেন। সেগুলিকে বলা হয় দোঁহা। কবীরের বহু দোঁহা আজও প্রচলিত।

কবীরের উপদেশ দেবার প্রণালী অত্যন্ত সরল ছিল। তিনি নিজে সংস্কৃত বা আরবী-ফারসী জানতেন না, কাজেই গল্পের মতো করে সহজ ভাষায় উপদেশ দিতেন।

হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের নিছক আচার-অনুষ্ঠানকে কবীর নিন্দা করেছেন। যাঁদের ভক্তি নেই, তাঁরা শুধু নাম আর মালা জপ করে ভগবানকে জানতে পারেন না। একথা বলতে গিয়ে তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর দোঁহা

রচনা করেছেন। একটি দোঁহায় আছে শুধু "রাম রাম" বললে যদি দুনিয়ার লোক উদ্ধার পায়, তা'হলে "চিনি চিনি" বললেও তো মুখ মিষ্টি হয়ে যাবে। ধর্মের এই সরল ব্যাখ্যায় যেমন একদল লোক কবীরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন, তেমনি আবার অন্য দিকে একদল মন্দিরের পাণ্ডা এবং মসজিদের মোল্লা তাঁর উপর চটে গেলেন। তাঁকে তাঁরা নানাভাবে অপমানিত করতে চেষ্টা করলেন। অবশেষে তাঁরা বাদশাহের কাছে কবীরের নামে নানা প্রকার অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলেন। বিচারে কবীর দোষী সাব্যস্ত হলেন। তাঁকে কাশী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। শেষ জীবনে তিনি উত্তর ভারতের নানা জায়গায় তাঁর ধর্মমত প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। অতি পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় গোরক্ষপুর জেলার মঘট নামক জায়গায়।

সারা জীবন ধরে কবীর যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর প্রচলিত কাহিনীর মধ্যেও সে আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। কিংবদন্তী এই যে মঘটের একটি কুটিরে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে কবীর শুয়েছিলেন। আর বাইরে তাঁর হিন্দু এবং মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে তুমুল বাক্-বিতণ্ডা হচ্ছিল। তাঁর দেহ হিন্দুমতে সৎকার করা হবে, না মুসলমান-প্রথা অনুযায়ী কবর দেওয়া হবে, এর মীমাংসা হচ্ছিল না। শেষে তিনি যখন দেহত্যাগ করলেন, তখন কুটিরের দরজা খুলে দেখা গেল সেখানে তাঁর দেহ নেই—রয়েছে দু' ভাগে ভাগ করা একরাশ শ্বেতপদ্ম। হিন্দু শিষ্যরা একভাগ কাশীতে নিয়ে গিয়ে সৎকার করলেন, আর মুসলমান ভক্তরা আর এক ভাগ কবর দিলেন। এভাবে কবীর হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই আপনার হয়ে রইলেন।

[সংক্ষেপিত]

* অনুশীলনী

১। ভক্ত কবীর কিরূপে রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন? রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর কবীর যে ধর্মমত প্রচার করিতে থাকেন তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর।

২। 'দোঁহা' বলিতে কী বুঝ?

৩। "সারা জীবন ধরে কবীর যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর

প্রচলিত কাহিনীর মধ্যেও সে আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।"—কবীরের মৃত্যুর প্রচলিত কাহিনীটি নিজের ভাষায় লিখ।

৪। কবীর কাশী হইতে বিতাড়িত হইলেন কেন ?

৫। কবীরের ধর্মমত অনুযায়ী সঠিক উত্তরটির পাশে (✓) চিহ্ন বসাও.ঃ

(ক) মানুষের মধ্যেই আল্লা ও ভগবান উভয়েই আছেন।

(খ) ভগবান আছেন কৈলাসে।

(গ) আল্লা আছেন কাবায়।

৬। বিপরীত শব্দ লিখ ঃ সীমাবদ্ধ ; প্রাচীন ; সরল ; অপবিত্র ; দোষী।

———

A nice example of Communal harmony. Kabir truly stands as the symbol of the same.



সুকুমার রায়

গরীব চাষা, তার নামে মহাজন নালিশ করেছে। চাষা কবে তার কাছে পঁচিশ টাকা নিয়েছিল, সুদে আসলে তাই এখন পাঁচশো টাকায় দাঁড়িয়েছে। চাষা অনেক কষ্টে একশো টাকা যোগাড় করেছে, কিন্তু মহাজন বলেছে, "পাঁচশো টাকার এক পয়সাও কম নয়, দিতে না পার তো জেলে যাও।" সুতরাং চাষার আর রক্ষে নেই।

এমন সময়ে শ্যামলা মাথায় চশমা চোখে তোখোড়-বুদ্ধি উকিল এসে বললে, "ঐ একশো টাকা আমায় দিলে, তোমার বাঁচবার উপায় বলতে পারি।" চাষা তার হাতে ধরল, পায়ে ধরল, বললে, 'আমায় বাঁচিয়ে দিন।" উকিল বললে,—',তবে শোন, আমার ফন্দি বলি। যখন আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে তখন বাপু কথা-টথা কয়ো না, যে যা খুশি বলুক, গাল দিক আর প্রশ্ন করুক, তুমি তার জবাবটি দেবে না—খালি পাঁঠার মতো 'ব্যা—' করবে। তা যদি করতে পার তা হ'লে আমি তোমায় খালাস করিয়ে দেব।" চাষা বললে, "আপনি কর্তা যা বলেন তাতেই আমি রাজী।"

আদালতে মহাজনের মস্ত উকিল, চাষাকে এক ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি সাত বছর আগে পঁচিশ টাকা কর্জ নিয়েছিলে?" চাষা

তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, “ব্যা—।” উকিল বললে, “খবর-দার! —বল, নিয়েছিলে কিনা? চাষা বললে, “ব্যা—।” উকিল বললে, “হুজুর? আসামীর বেয়াদবি দেখুন।” হাকিম রেগে বললেন, “ফের যদি অমনি করিস, তোকে আমি ফাটকে দেব। চাষা অত্যন্ত ভয় পেয়ে কাঁদ-কাঁদ হ’য়ে বললে, “ব্যা—ব্যা—।” হাকিম বললেন, “লোকটা পাগল নাকি।”

তখন চাষার উকিল উঠে বললে, “হুজুর, ওকি আজকের পাগল! ও বহু কালের পাগল, জন্ম অবধি পাগল। ওর কি কোন বুদ্ধি আছে, না কাণ্ডজ্ঞান আছে? ও আবার কর্জ নেবে কি! ও কি কখনও খত্ লিখতে পারে নাকি? আর পাগলের খত্ লিখলেই বা কি? দেখুন দেখি, এই হতভাগা মহাজনটার কাণ্ড দেখুন তো। ইচ্ছে ক’রে জেনেশুনে পাগলটাকে ঠকিয়ে নেবার মতলব করেছে। আরে ওর কি মাথার ঠিক আছে? এরা বলেছে, “এইখানে একটা আঙুলের টিপ্ দে—পাগল কি জানে, সে অমনি টিপ্ দিয়েছে। এই তো ব্যাপার!”

দুই উকিলের ঝগড়া বেঁধে গেল। হাকিম খানিক শুনে-টুনে বললেন, “মকদ্দমা ডিস্‌মিস।” মহাজনের তো চক্ষুস্থির। সে আদালতের বাইরে এসে চাষাকে বললে, “আচ্ছা, না হয় তোর চারশো টাকা ছেড়েই দিলাম—ঐ একশো টাকাই দে।” চাষা বললে, “ব্যা—।” মহাজন যতই বলে, যতই বোঝায়, চাষা তার পাঁঠার বুলি কিছুতেই ছাড়ে না। মহাজন রেগে-মেগে বলে গেল, “দেখে নেব, আমার টাকা তুই কেমন ক’রে হজম করিস্।”

চাষা তার পোঁটলা নিয়ে গ্রামে ফিরতে চলেছে এমন সময় তার উকিল এসে ধরল, “যাচ্ছ কোথায় বাপু? আমার পাওনাটা আগে চুকিয়ে যাও। একশো টাকায় যে রফা হয়েছিল, এখন মকদ্দমাতে জিতিয়ে দিলাম।” চাষা অবাক্ হ’য়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, “ব্যা—।” উকিল বললে, “বাপু হে, ও-সব চালাকি খাটবে না—টাকাটি এখন বের কর।” চাষা বোকার মত মুখ ক’রে আবার বললে, “ব্যা—”। উকিল তাকে নরম-গরম অনেক কথাই শোনালে, কিন্তু চাষার মুখে কেবলই ঐ এক জবাব। তখন উকিল বললে, “হতভাগা, গোমুখ্যু, পাঁড়াগেঁয়ে ভূত—তোর পেটে অ্যাতো শয়তানি

কে জানে। আগে যদি জানতাম তাহলে পোঁটলাটাসুদ্ধ টাকাগুলো আটকে রাখতাম।" বুদ্ধিমান উকিলের আর দক্ষিণা পাওয়া হল না।

* অনুশীলনী

১। অর্থ বল : তোখোড়-বুদ্ধি, ফন্দি, খালাস, কর্জ, কাণ্ডজ্ঞান, ডিসমিস্, চক্ষুস্থির, হজম করিস, রফা হয়েছিল, চালাকি খাট্‌বে না।

২। নিচের কথাগুলি বাক্যে ব্যবহার কর : কথা-টথা, খবরদার, রেগে-মেগে, চক্ষুস্থির, ডিসমিস, নরম-গরম।

৩। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(ক) গরীব চাষীর বিরুদ্ধে মহাজন নালিশ করিয়াছে কেন?

(খ) "তবে শোন্ আমার ফন্দি বলি"—একথা কে কাহাকে বলিয়াছিল? ফন্দিটি কি?

(গ) হাকিম কেন মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিলেন?

(ঘ) বুদ্ধিমান উকিলের দক্ষিণা পাওয়া হইল না কেন?

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) গরীব —, তার নামে — নালিশ করেছে।

(খ) চাষা তার — ধরল, — ধরল, বললে — "আমায় বাঁচিয়ে দিন"

(গ) দুই উকিলের — বেধে গেল।

(ঘ) ওর কি কোন — আছে, না — আছে?

(ঙ) বুদ্ধিমান উকিলের আর — পাওয়া হ'ল না।

৫। এই গল্পটি একটি হাসির গল্প। তবু এর মধ্যে একটি উপদেশ রহিয়াছে। উপদেশটি কি তাহা বল।

৬। বিপরীত শব্দ বল : প্রশ্ন, জন্ম, বুদ্ধিমান, আসামী, চালাকি, নরম।

———

n interesting story for evoking laughter.

আচার্য জগদীশচন্দ্র



কালিদাস রায়

সন্ধ্যার সময় একটি বালক নিজেদের বাগানে বল নিয়ে খেলা করছিল। বলটি হঠাৎ লতাপাতার ভেতর গিয়ে পড়লো। সে লাঠি নিয়ে ঝোপজঙ্গল থেকে বলটাকে বের করতে চেষ্টা করতে লাগল। তা, দেখে তার মা বললেন, "বাবা, গাছপালা ঘুমিয়ে আছে, ওদের এখন জাগিও না। বল কাল সকালে বের করবে।"

মায়ের কথা শুনে বালক চিন্তা করতে লাগল—গাছপালা তা হলে আমাদের মতো ঘুমায় ও জাগে? তা'হলে ওদেরও আমাদের মতো প্রাণ আছে? ওরাও কি ভোজন করে? এ প্রশ্নের উত্তর সে সেদিন কারোও কাছে পায়নি। নিজেই সে জবাব একদিন জগৎবাসীকে জানিয়েছিল।

কালো মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকায়। তার ঝলকে চোখ ঝলসে যায়। আঁকাবাঁকা গতিতে সে হঠাৎ আসে, আবার হঠাৎ উধাও হয়। কিন্তু সে আসেই বা কোথা থেকে আর যায়ই বা কোথায়? এই সমস্ত কথা চিন্তা করতে করতে বালকটি খেলা ছেড়ে কখনো গাছের নীচে গিয়ে বসে, কখনো বাগানের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে।

যখন এই বালক বড় হলেন তখন তিনি গাছপালা সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ করলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন গাছপালার স্বভাব অনেকটা আমাদের মতো। এই নূতন জিনিস আবিষ্কার করেই বালকটি একদিন পৃথিবী বিখ্যাত হন।

এই বালকের নাম—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয় ঢাকা জেলার রাঢ়িখাল গ্রামে ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ফরিদপুরে ডেপুটি কালেক্টার ছিলেন। তিনি নিজের গ্রামের পাঠশালায় জগদীশচন্দ্রকে পড়ানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন। পাঠশালায় কৃষক আর জেলের ছেলে ছিল তাঁর সাথী। কৃষকের ছেলে তাঁকে ক্ষেত ও গাছপালা সম্বন্ধে বলত আর জেলের ছেলে জলে বসবাসকারী জীবজন্তুদের গল্প শোনাতো।

বড় হওয়ার পরে জগদীশচন্দ্র কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়বার জন্য এলেন। কলেজের পড়া শেষ করে তিনি ইংলণ্ডে গেলেন। সেখানে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ইংলণ্ডে কিছু বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সান্নিধ্যের ফলে তাঁর নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কারের ইচ্ছা আরও তীব্র হয়েছিল।

পড়া শেষ করে জগদীশচন্দ্র নিজের দেশে ফিরে এলেন। এখানে এসে তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিলেন। ঐ সময় আমাদের দেশে ইংরাজের রাজত্ব ছিল। জগদীশচন্দ্রকে বিদেশী অধ্যাপক অপেক্ষা খুব কম বেতন দেওয়া হয়েছিল। ফলে জগদীশচন্দ্রের আত্মসম্মানে ঘা লাগল। তিনি বললেন, "হয় আমায় অন্য অধ্যাপকদের সমান বেতন দেওয়া হোক, নচেৎ আমি বিনা বেতনেই কাজ করব।" এইভাবে তিন বছর পর্যন্ত বেতনের এক পয়সাও তিনি নিলেন না। ফলে তাঁকে খুব অভাবে পড়তে হোল। পয়সার অভাবে তিনি শহর থেকে দূরে চন্দননগরে বাসা নিলেন। কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি বিজ্ঞানের নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কার করলেন। এ আবিষ্কারের বিষয়বস্তু জেনে পৃথিবীর মানুষ তাঁর জ্ঞানের খবর পেলেন। তখন থেকে তাঁকে কলেজে ঠিক বেতন দেওয়া হতে লাগল এবং তাঁর বাকী তিন বছরের বেতনও দিয়ে দেওয়া হলো।

বিজ্ঞানই জগদীশচন্দ্রের জীবন ছিল। এইজন্য তিনি বাধা ও বিঘ্নের সম্মুখে কখনোও মাথা নত করেননি। নিজের লক্ষ্য স্থির রেখে সর্বদা ঐ দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। ধৈর্য, সাহস এবং অধ্যাবসায়ের ফলে অবশেষে তিনি সাফল্য লাভ করতেন।

জগদীশচন্দ্র প্রথমে বেতারে সংবাদ পাঠানোর বিষয় আবিষ্কার করলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া দ্বারা অন্য কামরায় ঘণ্টা বাজালেন, তা' দেখে লোকেরা আশ্চর্য হল। ধাতুর সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র নতুন কিছু আবিষ্কার করলেন। তিনি বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রমাণ করে দেখালেন, নির্জীব ধাতুও পরিশ্রম করলে পরিশ্রান্ত হয়।

জগদীশচন্দ্রের সবচেয়ে অদ্ভুত আবিষ্কার গাছপালার সম্বন্ধে। এটা তোমরা পূর্বেই জেনেছ, তিনি ছেলেবেলা থেকে গাছপালার বিষয় জানার জন্য বড়ই উৎসুক থাকতেন! দীর্ঘদিন গবেষণা করে তিনি ঘোষণা করলেন গাছপালার মধ্যে সুখ-দুঃখ অনুভব করার শক্তি আছে। কিন্তু তাঁর এই কথা সেদিন বিশ্বাস করেনি। ঐ সময়ে এমন যন্ত্র ছিল না যার দ্বারা তিনি গাছের এই কার্যের প্রমাণ দেখান। তাই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজে গবেষণাগারে বসে যন্ত্রপাতি নির্মাণ করলেন। সেই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি জগৎবাসীর সম্মুখে প্রমাণ করে দেখালেন যে, গাছপালার আঘাত লাগে এবং মরবার সময় গাছও কাঁদতে থাকে। তিনি সর্বসমক্ষে গাছের কষ্ট এবং তার মৃত্যুর পূর্বে দুঃখের দৃশ্য একটি পর্দায়ও দেখালেন।

ধীরে ধীরে জগদীশচন্দ্র গাছপালার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করলেন, যেমন—গাছপালা প্রাণীদের মতো ঘুমায় ও জাগে, স্নেহ ও ক্রোধ প্রকাশ করে, জলের দ্বারা বৃদ্ধি পায় ও বিষের ক্রিয়ায় এদেরও মৃত্যু হয়।

এই জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কারের ফলে জগদীশচন্দ্র বসু তখন সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে 'ডক্টর অফ্ সায়েন্স' উপাধিতে সম্মানিত করল। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরা তাঁর এমন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার দেখবার জন্য তাঁকে তিনবার লণ্ডনে ডাকলেন।

গাছপালা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কারে জার্মান বিজ্ঞানীরা এতই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তাঁরা একটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ তার হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ডঃ বসু বললেন, "আমার কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ, আমি নিজের দেশে নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে কাজ করব। যখন আমাকে কেউ জানত না, সে সময় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ই আমার কাজ করার সুযোগ দিয়েছিল।"

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিজ দেশে বসেই বিজ্ঞান-সাধনা করেছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর নিয়ে তিনি একটি বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপন করলেন। কলকাতার 'বসু বিজ্ঞান-মন্দির' তাঁরই প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রবল ইচ্ছা ভারতবর্ষে এরূপ অনেক বিজ্ঞান মন্দির গড়ে উঠুক। ভারতবাসী বিজ্ঞান-চর্চা করার সুযোগ পেলে ভারত "জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে"—এই ছিল তাঁর আশা।

আজ ভারতে বহু বিজ্ঞান-গবেষণাগার তৈরী হচ্ছে। ভারতের আধুনিক বিজ্ঞান সাধনার অগ্রদূতকে আজও ভারতবাসী ভোলেনি। এই বিজ্ঞান সাধনা-ব্রতীকে আমরা প্রণাম জানাই।

* **অনুশীলনী**

১। "বাবা, গাছপালা ঘুমিয়ে আছে, ওদের এখন জাগিও না।"—উক্তিটি কাহার? কাহার প্রতি উক্তিটি করা হইয়াছিল? যাহার প্রতি উক্তিটি করা হইয়াছিল তাহার মনে ইহার ফলে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল?

২। "এই সমস্ত কথা চিন্তা করতে করতে বালকটি খেলা ছেড়ে কখনো গাছের নীচে গিয়ে বসে, কখনো বাগানের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে।"—বালকটি কে? কোন্ সমস্ত কথা চিন্তা করিতে করিতে বালকটি 'বাগানের ছায়ায়' ঘুমাইয়া পড়িত?

৩। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

(ক) জগদীশচন্দ্রের জন্ম কোথায়?

(খ) জগদীশচন্দ্রের জন্ম কত খ্রীষ্টাব্দে?

(গ) জগদীশচন্দ্রের পিতার নাম কি?

(ঘ) পাঠশালায় কাহারা তাঁহার সাথী ছিল? তাহারা জগদীশচন্দ্রকে কি গল্প শুনাইত?

(ঙ) ইংলণ্ডে থাকাকালীন জগদীশচন্দ্রের নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কারের ইচ্ছা তীব্র হইয়াছিল কেন?

(চ) প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনকালে কেন জগদীশচন্দ্র তিন বছর বিনা বেতনে কাজ করেন ?

(ছ) জগদীশচন্দ্রের সবচেয়ে অদ্ভুত আবিষ্কার কি ?

(জ) বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরা জগদীশচন্দ্রকে তিনবার লণ্ডনে ডাকিয়াছিলেন কেন ?

৪। টীকা লিখ ঃ ডক্টর অফ্ সায়েন্স ; বিজ্ঞান-মন্দির ; বসু বিজ্ঞান-মন্দির।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিশেষণ রূপ লিখ ঃ সাহস, অধ্যবসায়, জ্ঞান।

Life Sketch of an internationally fam…
Indian Scientist.

ধর্ম ও বিজ্ঞান



ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী

এক রাজার রাজ্যে হরিণের দল চরে বেড়াত। রাজা ভাল মানুষ। তবে বাইরে থেকে কেউ কেউ মাঝে মাঝে এসে সেখানে মৃগয়া করত। হরিণের দল রাজাকে বললো, "মহারাজ, আমাদের বিপদ দূর করতে হবে।" রাজা বললেন, "আমি তো কই তোমাদের মারিনে! তবে অপর কেউ কখনও তোমাদের মারবে না, এমন আশ্বাস দিই কি করে?" হরিণের দল সন্তুষ্ট না হয়ে নানা দেশে নিরাপদ স্থান খুঁজতে বের হল।

এক রাজ্যে গিয়ে দেখে অরণ্য সীমায় পাষাণে লেখা আছে, "এখানে কাউকে মৃগয়া করতে দেওয়া হয় না।" হরিণের দল সেই দেশের রাজার কাছে গেল। তিনিও বললেন "তাই বটে, সত্যি আমি এখানে কাউকে মৃগয়া করতে দিইনে। হরিণের দল আশ্বস্ত হয়ে পূর্ব রাজ্যের রাজাকে গিয়ে সব কথা বলে, তাঁর রাজ্য ত্যাগ করে, এখানে চলে এল।

দিন যায়, বিপদ-আপদ নেই। হরিণেরা আরামে বাড়ছে। একদিন দেখে, নূতন রাজা হাজার হাজার লোকলস্কর নিয়ে সমস্ত বন ঘিরে নিজেই পশুশিকারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। একটি পশুরও পালাবার পথ নেই। মৃগপতি রাজাকে জিজ্ঞাসা করলে, "এ কি মহারাজ, আপনি নাকি এখানে কাউকে শিকার করতে

দেন না?" রাজা বললেন, "অপর কাউকে দিই না বটে, কিন্তু খেয়াল হলে নিজে শিকার করি।" মৃগপতি বললেন, "আর কেউ শিকার করলে তবু দু-একটা মাত্র মারত। কিন্তু এমন করে সব মরতে ত হত না। আপনি যে আমাদের নিঃশেষ করতে চলেছেন। এখন কে আমাদের বাঁচায়?"

হরিণের মত আমরাও একদিন যে রাজার রাজ্যে ছিলাম, তাঁর নাম 'ধর্ম'। তিনি কখনও আমাদের নাশ করেননি। তবে অন্যদের সব রকম মার হতে সব সময় আমাদের রক্ষা করতেও ধর্ম পারেননি। এমন সময় নতুন রাজা এলেন 'বিজ্ঞান'। তিনি বললেন, এসব বিপদ হতে তোমাদের আমি রক্ষা করব। করলেও তাই। অন্ন বাড়ল, পণ্য বাড়ল, আধিব্যাধি দূর হল। সকলে ভাবলাম, বেশ আছি—পুরাতন রাজা ত এসব করতে পারতেন না। তাই ধর্মকে ছেড়ে আমরা বিজ্ঞানের রাজ্যেই গিয়ে আশ্রয় নিলাম।

কিন্তু হায়, আজ হঠাৎ একি দেখি! বিজ্ঞান-প্রভু স্বয়ং আকাশে উঠে চারিদিকে মৃত্যু বর্ষণ ও বিকীর্ণ করছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "প্রভু, এ কি, দারুণ লীলা! এত আশ্বাস দিয়ে এ কি ব্যবহার?" তিনি বললেন, "আমি ত মিথ্যা বলিনি। অপর কাউকে কি আমি এখানে মারতে দিয়েছি? তবে নিজে মারছি।" তখন ভাবলাম, আর কেউ মারলে তবু কতক মরলেও কতক বাঁচত, আর তুমি যদি স্বয়ং মারো, তবে যে সমূলে বিনাশ! এখন কার স্মরণ নিই? ধর্মের কথা বলাই যায় না কারণ তাকে ছেড়েই ত তোমার স্মরণ নিয়েছিলাম। হায়, তোমার শক্তি অপরিমিত, কিন্তু এই শক্তির সঙ্গে যে প্রেমের সংযম, তা কই? তুমি দেখছি লাগামহীন আরবী ঘোড়া; ঝোড়ো হাওয়ায় হালহীন পালের জাহাজ। এখন যে সর্বনাশের দিকেই ছুটে চলেছি। এখন কে আমাদের ত্রাণ করবে?

*** অনুশীলনী**

১। বিজ্ঞান মানুষের কোন্ কোন্ উপকার সাধন করিয়াছে বল।

২। "এ কি মহারাজ আপনি, নাকি এখানে কাউকে শিকার করতে দেন না?" —একথা কে কাহাকে বলিয়াছিল এবং কেনই বা বলিয়াছিল লিখ।

৩। "তাই ধর্মকে ছেড়ে আমরা বিজ্ঞানের রাজ্যেই গিয়ে আশ্রয় নিলাম।"—
কেন ধর্মকে ছাড়িয়া বিজ্ঞানের রাজ্যে আশ্রয় লইল তাহা ব্যাখ্যা কর।

৪। "হায়, তোমার শক্তি অপরিমিত, কিন্তু এই শক্তির সঙ্গে যে প্রেমের সংযম, তা কই ?"

আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখকের এই ভীতির কারণ কি ?

৫। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে লেখক কোন্‌টির প্রতি বেশী আগ্রহশীল এবং কেন, বুঝাইয়া বল।

৬। নীচের শব্দগুলির সাহায্যে এক একটি বাক্য রচনা কর ঃ
মৃগয়া, আশ্বস্ত, নাশ, বিকীর্ণ, সংযম।

A nice allegory. The danger of Science without virtue and morality has been very wisely depicted through the story.



নৌশেরার যুদ্ধ

যাযাবর

পুঞ্চ রক্ষা পেল, কিন্তু উদ্ধার হলো না। দুর্গ শক্ত হলো, মুক্ত হলো না। হানাদারেরা আগে ভাগেই দখল করে বসেছিল নৌশেরা ও তার আশেপাশের গ্রাম। সেখান থেকে তাদের হঠাতে না পারলে পুঞ্চ উদ্ধার করা কঠিন।

কঠিন কাজের জন্য চাই কঠিন পণ। সেই পণ ছিল ব্রিগেডিয়ার ওসমানের। পঞ্চাশ নম্বর প্যারা ব্রিগেডের অধিনায়ক হয়ে তিনি এসেছিলেন ঝানগড়ে।

উত্তর প্রদেশের আজমগঞ্জ জেলায় ওসমানের পৈতৃক বাস।

অতি তরুণ বয়সেই ওসমানের স্বভাব ছিল অস্বাভাবিক দৃঢ়তা। এক জাতীয় লোহা আছে যা' ভাঙ্গা যায় কিন্তু বাঁকানো যায় না। তার সঙ্গে বুঝি ওসমানের মিল ছিল। আর ছিল তার দেশাত্মবোধ সজাগ এবং সুতীক্ষ্ণ।

ব্রিগেডিয়ার ওসমান যে দিন ঝানগড়ে সৈন্যদলের অধিনায়ক হয়ে এলেন, তার দুদিন পরেই ঘটলো ভারতীয় বাহিনীর পরাজয়। তাদের পিছনে হটে আসতে হলো কয়েক মাইল। অন্য কেউ হয়তো মুষড়ে পড়তো এই প্রাথমিক বিফলতায়। ওসমানের বাড়লো জেদ।

প্রথমে ওসমান হানাদারদের হাত থেকে কেড়ে নিলেন কোট।

কোটের পরেই দখল করলেন নৌশেরা।

হানাদারদের সদর ঘাঁটিতে সবাই প্রমাদ গণল; বড় কর্তারা চটে-মটে কোটের সর্দারকে করলেন বরখাস্ত, নৌশেরার সেনাপতিকে করলেন কয়েদ। নতুন অধিনায়কের অধীনে হাজার হাজার সৈন্য-সামন্ত দিয়ে পাঠালেন যুদ্ধে। হুকুম করলেন, আবার দখল করা চাই হারানো এলাকাগুলি। যে হেরে পালিয়ে আসবে তার যাবে গর্দান। হয় নৌশেরা, নয় তো শির।

মরিয়া হয়ে হানাদারেরা নিশুতি রাতে আক্রমণ করল নৌশেরা। দক্ষিণ, পূর্ব আর উত্তর—তিন দিক থেকে এল তিন তিনটে বাহিনী। সব মিলিয়ে প্রায় হাজার পনেরো হানাদার। সঙ্গে তাদের বিলাতী রাইফেল, মাঝারি ও হাল্কা মেশিনগান, মর্টার ও গ্রেনেড।

প্যারা ব্রিগেডের সৈন্যদল বিপুল বিক্রমে বাধা দিল এই বিশাল শত্রুতরঙ্গ। হানাদারদের লক্ষ্য,—যে করেই হোক আবার দখল করবে নৌশেরা। ভারতীয় বাহিনীর পণ,—যে করেই হোক রক্ষা করবে নৌশেরা। কাশ্মীরের সংঘর্ষে এমন কঠোর ও এমন ভীষণ যুদ্ধ আর ঘটে নি। দু'দলই করেছে জান কবুল। যেন দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে। রাত শেষ হলো। যুদ্ধ শেষ হলো না। কাটলো দুপুর। তবু যুদ্ধের বিরাম নেই। বেলা গড়িয়ে গিয়ে অপরাহ্নের ক্লান্ত সূর্য নামলো পাটে। তখনও চললো হানাহানি।

ব্রিগেডিয়ার ওসমান গোড়াতেই বুঝেছিলেন শত্রুসংখ্যা অগুণতি। তাঁর নিজের বাহিনীর চতুর্গুণ। তিনি সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন পিছনের ঘাঁটিতে।

অবশেষে শত্রুসৈন্য এসে পড়ল আরও নিকটে। একেবারে ঘাড়ের উপরে। ওসমান অধীর হয়ে তাকাচ্ছেন ডাইনে, বাঁয়ে, পিছনে। সৈন্য, আরও সৈন্য চাই এই মুহূর্তে। কিন্তু কোথায় পাবেন সৈন্য? দেখলেন ছাউনীর কারখানা ঘরে এঞ্জিনীয়রেরা করছে যন্ত্রপাতি মেরা-মত। হাঁক দিয়ে বললেন ব্রিগেডিয়ার, "যেখানে যে আছো বন্দুক নিয়ে চলে এসো সম্মুখের সারিতে। কোন মতে ঠেকিয়ে রাখো শত্রুকে।"

এঞ্জিনীয়রেরা হাতুড়ি ফেলে হাতে নিলো হাতিয়ার।

সরবরাহ বিভাগের কর্মীদের কাজ রসদ যোগানো। তারা থাকে আসল যুদ্ধ-ক্ষেত্রের অনেক পিছনে। তাঁদেরও নামাতে হলো যুদ্ধে।

ব্রিগেডিয়ার ঘূর্ণির মত ঘুরছেন তাঁবুতে তাঁবুতে। যাকে সামনে পান তাকেই যুদ্ধে পাঠান। "তুমি কে? রাধুনী? এখন রান্না থাক্ পড়ে। লড়াই করো। তুমি মশালচি? কুছ পরোয়া নেই, হানাদারদের রোখো"

যে লোকটা চিরকাল হিসেবের খাতা লেখে, খড়ি রেখে খাঁড়া ধরতে হলো তাকেও।

পিছন থেকে শোনা গেল বহু কণ্ঠে শিখদের রণ-হুঙ্কার। নতুন সৈন্যদল এসে পোঁচেছে এতক্ষণে।

নতুন সৈন্যদলের সঙ্গেই এল ভারতীয় বিমান বাহিনীর খান কয়েক বোমারু বিমানের গুলীবর্ষণ—এ দু'-এর্ সামনে হানাদারেরা টিকে থাকবে কতক্ষণ?

সহস্র সহস্র হানাদারদের মৃতুদেহ পড়ে রইল মাঠে, পথে, পাহাড়ের গায়ে, যেখানে-সেখানে! ভারতীয় সৈন্যদের জয়ধ্বনিতে ক্ষণে ক্ষণে সচকিত হলো দূর ও নিকটের গিরিকন্দর, নৌশেরার যুদ্ধ হল সারা। যে পথ দিয়ে শত্রু এসেছিলো, সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা

* অনুশীলনী

১। বানান, অর্থ ও ব্যবহার লিখ: .উদ্ধার, পৈতৃক, দেশাত্মবোধ, সুতীক্ষ্ম, প্রমাদ, দংশনক্ষত, মশালচি, রণ-হুংকার, সচকিত।

২। বিপরীত শব্দ লিখ: বিফলতা, বরখাস্ত, বিরাম, অগুণতি, অধীর।

৩। শির, ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ—কথাগুলির অর্থ অভিধান দেখিয়া ঠিক কর।

৪। ব্রিগেডিয়ার ওসমান কি করিয়া হানাদারদের আক্রমণ হইতে নৌশেরা রক্ষা করিলেন, তাহা নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৫। 'নৌশেরার যুদ্ধ' প্রবন্ধে ভারতীয় জোয়ানদের যে বীরত্বের ছবিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

৬। ব্রিগেডিয়ার ওসমানের চরিত্রটি তোমার কেমন লাগে এবং কেন তাহা সংক্ষেপে লিখ।

৭। শূন্যস্থানে কথা বসাও ঃ

(ক) পুঞ্ছ—পেল, কিন্তু—হলো না। দুর্গ—হলো,—হলো না।

(খ) প্রথমে ওসমান হানাদারদের হাত থেকে কেড়ে নিলেন—; কোটের পরেই দখল করলেন—।

(গ) রাত—হলো। যুদ্ধ—হলো না। কাটলো—।

(ঘ) হানাদারদের সদর ঘাঁটিতে সবাই—গণল।

(ঙ) কাশ্মীরের সংঘর্ষে এমন—ও এমন – যুদ্ধ আর ঘটেনি।

৮। প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

(ক) নৌশেরা যুদ্ধের বর্ণনা লিখ।

(খ) 'হাতুড়ি ফেলে হাতে নিলো হাতিয়ার'—কারা? কথাটির অর্থ বুঝাইয়া বল।

———

vivid description of saving Country from the hands of the vadors. Brigadier Osman is an example of ideal patriots.



প্রবোধকুমার সান্যাল

হরিদ্বার থেকে লছমনঝুলা হয়ে প্রথম চারদিন হাঁটবার পর যে ছোট পাহাড়ী শহর পাওয়া যায়, তাহার নাম 'দেবপ্রয়াগ'। বছরে বছরে কত যাত্রী এই পথ ধরে বদরীনাথ দর্শন করতে যায়। হিমালয় পর্বত শোভা ও সৌন্দর্যের লীলাভূমি। পাহাড়গুলি ঘন সবুজ, জঙ্গলময়। এত ফল, এত ফুল, এত ঐশ্বর্য, অথচ ভোগ করবার মানুষ নেই। কোথাও কোথাও দেখা যায়, দু'মাইল কি তিন মাইল দূরে মাথার উপর ছোট্ট একখানি পাহাড়ী গ্রাম।

দেবপ্রয়াগ থেকে চব্বিশ মাইল পথ এগিয়ে রুদ্রপ্রয়াগ। এও একটি ছোট শহর। এই রুদ্রপ্রয়াগে পথটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি পথ গেছে সোজা কেদারনাথ-পাহাড়ের দিকে, অন্য পথটি গেছে কর্ণপ্রয়াগ ও চামেলী হয়ে বদরীনাথের দিকে। আমরা চললাম কেদারনাথের দিকে। এই পথ অতি কঠিন ও দুরারোহ। মানুষের শক্তির সকলের চেয়ে বড় পরীক্ষা হয় এই হিমালয় ভ্রমণ করতে এলে। শক্তির পরীক্ষা শুধু নয়—শক্তি, সাহস, ধৈর্য ও দুঃখের পরীক্ষা।

নদীর পর নদী, পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে চলেছি। পথে পড়ে গুপ্তকাশী, এও একটি শহর। কতকগুলি লোকালয় আছে। গরমকালে যাত্রীরা এই পথ দিয়ে যায়, তাই দোকান-পাট বসে। গুপ্তকাশী পার হয়ে

চড়াই পথে ত্রিযুগীনারায়ণ আসে। এখানে একটি ধুনি জ্বলছে তিন যুগ থেকে, দ্বাপর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই ধুনি একটি মুহূর্তের জন্যেও নেভেনি। পাণ্ডারা কাঠ যুগিয়ে চলে। এখান থেকে অতি নিকটেই বরফের রাজ্য দেখা যায়। এ মুলুকে শীতের হাওয়া অতি যন্ত্রণাদায়ক। ত্রিযুগীনারায়ণ থেকে নেমে নদী পার হয়ে পথ উঠে গেছে গৌরীকুণ্ডের দিকে।

গৌরীকুণ্ডের পর রামওয়াড়া চটি, তারপর পাঁচ মাইল চড়াই পার হয়ে গেলে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের মধ্যে কেদারনাথের মন্দির চোখে পড়ে। আমরা যখন পথ দিয়ে যাচ্ছি, তখন বরফ পড়ছে। আকাশে ঘন বৃষ্টির মেঘ, সকাল বেলাতেও চারিদিক্ অন্ধকার, যুঁই ফুলের মত তুষার পড়ছে ঝর ঝর করে; তুষার যখন পড়ে তখন তার শব্দ হয় না, জলের বদলে মেঘ থেকে পড়ে তুষার। এত হু হু করে হাওয়া যে শরীরের হাড় পর্যন্ত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে। চিরতুষারের দেশে আমরা এসে পৌছলাম। পথের দু'ধারে স্তূপীকৃত মিছরীর দানার মত বরফ কঠিন হয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে। কোথাও কোথাও জল জমে শক্ত হয়ে আছে। বেশ পরিষ্কার চক্‌চকে জল, অথচ হাত দিয়ে দেখি জমাট, কঠিন, আয়নার কাচের মত পুরু। যেন প্রায় আধ ইঞ্চি কাচের জল টল্‌মল করছে।

যে পথ দিয়ে এসেছি, সে পথ ধরেই চব্বিশ মাইল আবার আমরা নেমে এলাম। সাধারণত যাত্রীরা একদিনে দশ মাইল থেকে পনেরো মাইল পর্যন্ত হাঁটে। পথে চটিতে আটা, চাল, ঘি আর আলু পাওয়া যায়, এ ছাড়া আর কিছুই খাদ্যবস্তু নেই। ডাল কোথাও কোথাও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা দেশের জলের গুণে তা সিদ্ধ হয় না। পথে যেখানে যেখানে সামান্য সমতল জায়গা আছে, সেখানে চাষ বাস হয়, চাষের কাজ মেয়েরাই করে। এরা অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্তু আশ্চর্যরূপ সরল, ধর্মভীরু ও ভদ্র। হিমালয়ের বাইরে যে বৃহৎ জগৎ আছে, সেখানে যে ট্রেন চলে মোটর চলে, জাহাজ ভাসে, ফুটবল খেলা হয়, কলের চিমনিতে ধোঁয়া ওঠে, মেসিনের চাকায় মানুষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য তৈরী হয়—এ সব তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। তারা শুধু বোঝে পাথর আর বন, নদীর ঘর্ঘর শব্দ, ঝর্ণার ঝরঝরানি, বন্য জন্তুর গর্জন,

তুষারের প্রপাত, তীর্থ মন্দির; তারা শুধু বোঝে শরীরের পরিশ্রম, ডাল-রুটি।

দু'দিন চলবার পর একদিন সন্ধ্যায় যোশীমঠে পৌঁছালাম। পরদিন সকালে এখান থেকে নেমে বিষ্ণুগঙ্গা পার হয়ে বদরীনাথের দিকে চললাম। আর উনিশ মাইল পথ। আর দেরী নেই, কী আনন্দ, কী উল্লাস! আর মাত্র উনিশ মাইল।

আট মাইল পথ গিয়ে পেলাম পাণ্ডুকেশ্বর। সুমুখের পাহাড়ে আগে পাণ্ডুরাজার বহু কীর্তি ছিল। বর্তমানকালে এখানে সবই শ্মশান। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি, আমাদের এই ভারতবর্ষের সকল জায়গায় রামায়ণ ও মহাভারত ছাড়া আর কিছুই নেই। যেখানেই যাও, মহাভারতের কথা কিংবা রামায়ণের গল্প—এই হিমালয়ের রাজ্যের মানুষেরা আর কিছু শোনেনি।

বিকেলবেলা হনুমানচটিতে এসে আশ্রয় নিলাম। কোন রকমে কম্বল জড়িয়ে শীত নিবারণ করে রাত কাটিয়ে দেওয়া গেল। বাইরে তুষারের হাওয়া, মেঘলা আকাশ আর বৃষ্টি, তবু এত দুর্যোগেও রাত কাটল। প্রাতঃকালে উঠে গঙ্গার ধারে ধারে চললাম, আর মাত্র পাঁচ মাইল। ছুটে চল্, ছুটে চল্—আর দেরী নেই। এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা, এবার মিলবে দুর্লভের দেখা। ওরে ছুটে চল্, ছুটে চল্।

ঠাণ্ডায় সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরেছে, বাতাস ছুঁচের মত এসে বিঁধছে—তবু ওই দূরে মন্দির দেখা গেল; ওই আর দেরি নেই, দেবতা সদয় হয়েছেন, তুষারের ভেতর থেকে মন্দির জেগে উঠছে—ওরে দীন, ওরে অন্ধ, চোখ তুলে দেখ ও কী!

গঙ্গার পুল পার হয়ে যাত্রীরা মন্দিরের ধারে এসে চীৎকার করে কাঁদলো, হাসলো, গলা চিরে দেবতাকে ডাকতে লাগলো—যেন তাদের হিস্টিরিয়া হয়েছে। কেউ বা আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে আগুন জ্বালিয়ে তার ধারে হাত-পা গরম করতে বসে গেল।

এই হচ্ছে হিমালয়ের চেহারা। এ যেমন সুন্দর তেমনি ভীষণ। যারা সাহসী, শক্তিশালী, কষ্টসহিষ্ণু, তারাই যাবে হিমালয়-ভ্রমণে; তারা সত্যিকারের আনন্দ পাবে।

***অনুশীলনী**

১। দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী ও ত্রিযুগীনারায়ণ প্রভৃতি স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। লেখক বলিয়াছেন—‘হিমালয় যেমন সুন্দর তেমনি ভীষণ’ এই কথার তাৎপর্য কি?

৩। ‘হিমালয়ের পথে’র ভ্রমণকালে লেখক যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা তোমার নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

৪। অর্থ বল ঃ দুরারোহ, দুর্লভ, নিবারণ, স্বাচ্ছন্দ্য।

৫। “আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি, আমাদের এই ভারতবর্ষের সকল জায়গায় রামায়ণ ও মহাভারত ছাড়া আর কিছুই নেই।”—এই কথার অর্থ কি? রামায়ণ ও মহাভারতের কোন ঘটনা জানা থাকিলে বর্ণনা কর।

The attraction of the Himalayas is practically universal. This piece of trave[l]ogue describes ~~[illegible]~~ the experience [o]f travelling through the dangerous paths of [th]e Himalayas.



স্বদেশভক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাগজে কি একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্নে জ্যোতিদাদা নিলামে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে, তিনি সাত হাজার টাকা দিয়া একটা জাহাজের খোল কিনিয়াছে। এখন ইহার উপরে এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা তৈরী করিয়া একটা পুরা জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে।

দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায় কিন্তু জাহাজ চালায় না। বোধ করি, এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল। দেশে দেশলাই কাঠি জ্বালাইবার জন্য তিনি একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশলাই কাঠি অনেক ঘর্ষণেও জ্বলে নাই। দেশে তাঁদের কল চালাইবার জন্যেও তাঁহার উৎসাহ ছিল। কিন্তু সেই তাঁতের কল একটি মাত্র গামছা উৎপন্ন করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে।

তাহার পরে স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্যে তিনি হঠাৎ একটা শূন্য খোল কিনিলেন।

সে খোল একদা ভরতি হইয়া উঠিল, শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে,—ঋণে এবং সর্বনাশে।

কিন্তু তবু একথা মনে রাখিতে হইবে, এই সকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা, সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন। আর ইহার লাভ যাহা, তাহা নিশ্চয়ই এখনও তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে।

একদিকে বিলাতী কম্পানী, আর একদিকে তিনি একলা—এই দুই পক্ষে বাণিজ্য-নৌযুদ্ধ ক্রমশই প্রচণ্ড হইয়া উঠিল।

প্রতিযোগিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরী হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল। আয়ের অঙ্ক ক্রমঃশই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল।

বরিশাল খুলনার ষ্টীমারলাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনা ভাড়ায় যাতায়াত শুরু করিলেন—তাহা নহে, তাঁহারা বিনা-মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিলেন।

ইহার উপরে বরিশালের ভলান্টিয়ার দল স্বদেশী কীর্তন গাহিয়া যাত্রী সংগ্রহে লাগিয়া গেল। সুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না, কিন্তু আর সকল প্রকার অভাবই বাড়িল।

অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে স্বদেশহিতৈষণার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় না। কীর্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়ুক, গণিত আপনার নামতা ভুলিতে পারিল না। সুতরাং জ্যোতিদাদার কারবার ফড়িংয়ের মত লাফ দিতে দিতে ঋণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অবশেষে একদিন খবর আসিল, তাঁহার "স্বদেশী" নামক জাহাজ হাবড়ার ব্রিজে ঠেকিয়া ডুবিয়াছে।

এইরূপে যখন তিনি তাঁহার সাধ্যের সীমা একেবারে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিলেন, তখনই তাঁহার ব্যবসা বন্ধ হইয়া গেল।

* অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশ ভক্তির পরিচয় দাও।

২। নিজের ভাষায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাহাজ-ব্যবসার কাহিনীটি বর্ণনা কর।

৩। শব্দার্থ বল ও বাক্য রচনা কর ঃ—
ঘর্ষণ, নৌ-যুদ্ধ, তাড়না, উপসর্গ, সত্যযুগ, অতিক্রম।

৪। পদ পরিবর্তন কর ঃ—
নির্মাণ, উৎসাহ, শূন্য, প্রচণ্ড, সীমা।

৫। বর্তমান কালে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভে মানুষের মুক্তি ঘটে না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও একান্ত প্রয়োজন। এই প্রবন্ধটিতে লেখকের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতে যাইয়া যে অসামান্য ত্যাগ করেন, তাহা ব্যাখ্যা কর।

Patriotic spirit knows no obstacle

উশীনরের উপাখ্যান

কালিদাস রায়

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে উশীনর নামে এক রাজা ছিলেন। রাজকার্য ছাড়াও যাগ-যজ্ঞ, পরোপকার তাঁহার প্রধান ব্রত ছিল। পরম ধার্মিক রাজা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। একবার দেবরাজ ইন্দ্র ও অগ্নিদেব উশীনরের খ্যাতি শুনিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য পৃথিবীতে নামিয়া আসিলেন। ইন্দ্র অগ্নিকে বলিলেন, "উশীনর কত বড় ধার্মিক রাজা তাহা আমি পরীক্ষা করিতে চাই। আপনি কপোতরূপে ও আমি শ্যেনরূপে রাজার কাছে গিয়া উপস্থিত হইব।"

উশীনর রাজসভায় বসিয়া রাজকার্য করিতেছেন। সহসা সেখানে একটি ভীত কপোত আসিয়া উপস্থিত হইল। আর তাহার পিছনে ছুটিয়া আসিল একটি ক্ষুধার্ত শ্যেনপক্ষী। প্রাণের ভয়ে কপোত ছুটিয়া গিয়া রাজা উশীনরের কোলে আশ্রয় লইল। রাজা তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া তাহার ভয় দূর করিলেন।

শিকার হাতছাড়া হইল দেখিয়া শ্যেন উশীনরকে বলিল, "মহারাজ, আমি ক্ষুধার্ত। এই কপোতই আমার খাদ্য। আমাকে খাদ্য হইতে বঞ্চিত করিলে আপনার অধর্ম হইবে। ইহাকে আপনি ছাড়িয়া দিন।"

উশীনর বলিলেন, "এই কপোত প্রাণভয়ে আমার কাছে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। আশ্রিতকে আমি ত্যাগ করিতে পারি না।"

শ্যেন উত্তর করিল, "আপনি যদি আমাকে আহার হইতে বঞ্চিত করেন তবে আমার মৃত্যু হইবে। আমার মৃত্যু হইলে আমার স্ত্রী-পুত্র সকলেই মরিবে। আপনি একটি কপোতকে রক্ষা করিতে গিয়া বহু প্রাণ নষ্ট করিবেন। রাজা, এমন অধর্ম আপনি করিবেন না।"

রাজা উশীনর বলিলেন, "তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা ঠিক। কিন্তু তুমি আশ্রিতকে পরিত্যাগ করিতে বলিতেছ কেন? আহার করা তোমার উদ্দেশ্য। তোমাকে আমি আহারের জন্য অন্য মাংস আনিয়া দিতেছি। যে মাংস তুমি আহার করিতে চাও, তাহাই আমি আনিয়া দিব।"

শ্যেন বলিল, "মহারাজ, বিধাতা এই কপোতকে আমায় খাদ্য হিসাবে ঠিক করিয়া দিয়াছেন। ইহার মাংস ছাড়া আমি আর অন্য কিছু চাই না।"

উশীনর বলিলেন, "আশ্রিতকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না। তুমি তাহার বদলে আমার এ সমৃদ্ধ রাজ্য, ধনরত্ন যাহা চাও তাহাই পাইবে। কিন্তু, এই নিরীহ কপোতটিকে তুমি চাহিও না। সে বিপন্ন হইয়া আমার কাছে আশ্রয় লইয়াছে।"

শ্যেন বলিল, "কপোতের উপর যদি আপনার এতই স্নেহ থাকে তবে কপোতের গায়ে যে পরিমাণ মাংস আছে, সেই পরিমাণ মাংস নিজের দেহ হইতে কাটিয়া আমাকে দান করুন।"

উশীনর বলিলেন, "শ্যেন, তুমি যে আমার প্রতি এই দয়া দেখাইলে তাহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার কথামত আমি আমার দেহের মাংস কাটিয়া তোমাকে দান করিব।"

এই বলিয়া উশীনর মাংস ওজনের জন্য তুলাযন্ত্র আনিতে বলিলেন। দাঁড়িপাল্লা আনা হইলে তিনি উহার একদিকে কপোতকে রাখিয়া অপরদিকে নিজের মাংস কাটিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! যতই তিনি নিজের দেহের মাংস কাটিয়া রাখেন কিছুতেই তাহা কপোতের ওজনের সমান হয় না। বারবার উশীনর আপন দেহ হইতে মাংস কাটিয়া দিতে লাগিলেন। রক্তে মাটি ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এত মাংসেও কপোতের সমান হইল না। অবশেষে উশীনর নিজেই তুলাযন্ত্রে উঠিয়া বসিলেন। চারদিকে সভার লোকে অবাক্ হইয়া উশীনরের আত্মত্যাগ দেখিতে লাগিল।

তখন শ্যেন বলিল, "মহারাজ উশীনর, আমি ইন্দ্র আর এই কপোত অন্য কেহ নহেন—অগ্নিদেব। আমরা তোমার ধর্মজ্ঞান পরীক্ষার জন্য এখানে আসিয়াছিলাম। আজ দেখিলাম, তোমার মত ধার্মিক রাজা পৃথিবীতে যথার্থই নাই। আশ্রিতের রক্ষার জন্যে তুমি যে ত্যাগ ও সাহস দেখাইলে, তাহা অতুলনীয়। তোমার ধর্মজ্ঞানের জন্য পৃথিবীর লোকে তোমাকে চিরদিন স্মরণ করিবে।" এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ও অগ্নিদেব প্রস্থান করিলেন। ধার্মিক উশীনরও অনেক পুণ্যকাজ করিয়া মৃত্যুর পরে স্বর্গে গমন করিলেন।

* অনুশীলনী

১। "তোমার ধর্মজ্ঞানের জন্য পৃথিবীর লোকে তোমাকে চিরদিন স্মরণ করিবে।"

—বক্তা কে? কিরূপে কাহার ধর্মজ্ঞানের পরিচয় পাইলেন, বল।

২। "আপনি একটি কপোতকে রক্ষা করিতে গিয়া বহু প্রাণ নষ্ট করিবেন" —কে, কি প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছে?

৩। (ক) ইন্দ্র ও অগ্নিদেব কেন পৃথিবীতে নামিয়া আসিলেন?

(খ) উপাখ্যানটি পড়িয়া কি শিক্ষা লাভ করিলে সংক্ষেপে বল।

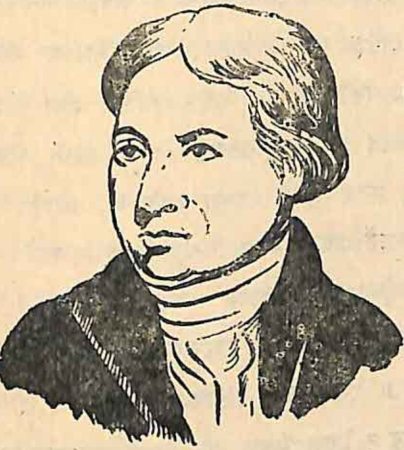
৪। নিম্নলিখিত বিশেষণগুলিকে বিশেষ্য পদে পরিবর্তন কর ঃ—

ধার্মিক, ক্ষুধার্ত, ভীত, সাহসী।

৫। অর্থ লিখ ঃ—

শ্যেন, কপোত, ব্রত, বঞ্চিত, আশ্রিত, সমৃদ্ধ, পাত্রমিত্র।

This story gives a noble idea of sacrifice, sympathy and virtue



এডওয়ার্ড জেনারের আবিষ্কার

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

শুনেছিলাম, আমার জেঠামশায়ের বাংলা টিকা হয়েছিল, আর আমার বাবার হয়েছিল ইংরেজী টিকা। সে প্রায় একশ' বছর আগেকার কথা। এই সময়ে আমাদের দেশে বাংলা টিকার প্রচলন উঠে গিয়ে ইংরেজী টিকা দেওয়া শুরু হল।

'বাংলা টিকা' যাকে বলা হত তা ছিল এই—বসন্ত রোগাক্রান্ত লোকের গুটি থেকে একটু পুঁজ নিয়ে তা একজন সুস্থ লোকের রক্তে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হত। এর ফলে ওই লোকের ভবিষ্যতে আর বসন্ত রোগ হবার সম্ভাবনা থাকত না। তা থাকত না বটে, কিন্তু ওই রকম ইনজেক্‌সনের ফলে তখন তার বসন্ত রোগ দেখা দিত, আর সময় সময় তা সাংঘাতিক আকার ধারণ করত। কিন্তু তবুও তা ছিল মন্দের ভালো। কারণ আগের দিনে বসন্তরোগ আকছার লোকের মধ্যে দেখা দিত, কেউ বাঁচত, অনেকে মরত। যারা বাঁচত তাদের শ্রী চলে যেত।

যে বাংলা টিকার কথা বলা হল, তা এ দেশে একশ' বছর আগে অবধি চলিত ছিল, কিন্তু কতদিন যাবত তা চলে আসছিল সঠিক জানা যায় না। তখন ভারতবর্ষ, তুরস্ক প্রভৃতি ছাড়া আর কোন দেশে এ পদ্ধতি জানত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লেডি মণ্টেগু নামে একজন ইংরেজ মহিলা কনস্টান্টিনোপলে বাস করছিলেন. তিনি ওখানে ওই পদ্ধতির কথা অবগত হন, আর নিজের দেশে ফিরে এসে তা চালু করবার বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু দেশের লোকের কাছে সে রকম সাড়া পাওয়া গেল না, এইরূপ টিকা দেবার জন্যে যে বসন্ত হয়, তাতে মাঝে মাঝে শিশুর প্রাণহানি ঘটে। তা ছাড়া শিশুর দেহের বসন্ত সংক্রামিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

জেনার ডাক্তারি পাস করেছেন, চিকিৎসার্থ পল্লীগ্রামে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। দেখলেন, একটা শবযাত্রা আসছে। ঘোড়াটাকে রাস্তার পাশে রেখে টুপি খুলে তিনি অভিবাদন করলেন। মৃতের স্ত্রী কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, জেনারকে দেখে করুণস্বরে বললেন—বসন্ত রোগে মৃত্যু হয়েছে। জেনার বললেন, আমি কি টিকা নেবার কথা বলিনি? দলের কয়েকজন উত্তর দিল, কিন্তু তাতে বিপদের কিছু কমতি ছিল না।

জেনার চিন্তা করতে করতে বাড়ি ফিরলেন। তাঁর নিজের কথা মনে পড়ল; টিকা নেবার পর তিনি ছয় সপ্তাহ শয্যাশায়ী ছিলেন। ওই রকমের টিকা নেওয়া ছাড়া বসন্ত নিবারণের আর কি কোন সহজ পথ নেই? ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি কথাটা ভেবে এসেছেন, কিন্তু কোন কূল-কিনারা পাননি। একজন এক গোয়ালিনী এক সময় জেনারকে বলেছিল, যে তার আর বসন্ত হবার ভয় নেই, কারণ তার একবার গো-বসন্ত হয়ে গিয়েছে। সেই কথাটা জেনারের মনে পড়ে গেল। এর মধ্যে কি কোন সত্য আছে। গোয়ালিনীদের কারুর মুখে তিনি বসন্তের দাগ দেখেননি। গো-বসন্ত দিয়ে কি তারা এই ভয়াবহ রোগকে এড়িয়ে যাচ্ছে। জেনার চিন্তা করে চলেছেন।

একদিন সারা নেলমিস নামে একজন গোয়ালিনী তাঁর কাছে এসে তার

হাতটা দেখাল। একটা বড় ফোঁড়া হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনার জানলেন যে সেটা গো-বসন্ত। জেনার একটা মলমের ব্যবস্থা করে তাকে বসতে বললেন, তারপর তাঁর যন্ত্র দিয়ে ওই ফোঁড়া থেকে কিছু পুঁজ সংগ্রহ করলেন। তখনই তা নিয়ে এক গ্রামে উপস্থিত হলেন। জেমস্ ফিলিপস নামে একটি ছেলেকে টিকা দিতে হবে। বাড়ির লোক সন্ত্রস্ত। জেনার সকলকে অভয় দিয়ে বললেন, আমি আজ এক নূতন ধরনের টিকা দিয়ে যাব, এতে ছেলেটির এখন বসন্ত দেখা দেবে না, অথচ ভবিষ্যতে সে ওই রোগের আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবে। গো-বসন্ত থেকে নেওয়া পুঁজ সঙ্গে ছিল, তিনি তাই দিয়ে টিকা দিলেন। তারপর প্রত্যহ ছেলেটিকে দেখতে আসতেন, ছেলেটির বসন্ত দেখা দিল কিনা। কিছুদিন পরে সেই পাড়ায় বসন্ত রোগ ভীষণভাবে দেখা দিল, বহু লোক প্রাণ হারাল, কিন্তু সেই ছেলেটির কিছু হল না।

আরও পরীক্ষা চাই। দু'বছর ধরে বহু পরীক্ষা করে শেষে ১৭৯৮ সালে জেনার তাঁর নতুন আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন। ডাক্তারেরা জেনারের কথা হেসে উড়িয়ে দিল। ব্যঙ্গচিত্র বেরল, গোরুর পুঁজ নিয়ে টিকা দেওয়ায় মানুষের মুখ গোরুর মত হয়েছে, শিং গজিয়েছে। রয়াল সোসাইটিতে তিনি তাঁর গবেষণা পাঠালেন, অমনোনীত হয়ে তা ফেরত এল।

জেনার কিন্তু দমলেন না। তিনি তাঁর ছেলেকে তিন তিনবার টিকা দিলেন। কাছে একখানা গ্রামে অনেক গরীব লোক বাস করত, জেনার তাদের সকলকে টিকা দিয়ে দিলেন, ফলে দেখা গেল সে পাড়ায় আর কারও বসন্ত হল না। তখন ধীরে ধীরে লোকে জেনারের মতে আস্থাবান হতে থাকল, দু' একজন সম্ভ্রান্ত লোক নিজেদের ছেলেমেয়েকে টিকা দেবার জন্যে জেনারের কাছে আসতে আরম্ভ করলেন। জেনার নেপোলিয়নের বিশেষ প্রিয় হলেন, নেপোলিয়ান নিজে টিকা নিলেন। একবার যুদ্ধে বন্দী দু'জন ইংরেজকে দেশে ফিরিয়ে নেবার জন্যে জেনার নেপোলিয়নকে আবেদন জানান। নেপোলিয়ন দরখাস্তখানা নামাঞ্জুর করতে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল যে দরখাস্তখানা

আসছে টিকার আবিষ্কারকের কাছ থেকে। নেপোলিয়ন তৎক্ষণাৎ বললেন, ওই ব্যক্তিকে অদেয় আমার কিছু নেই। ফলে লোক দু'জনকে ছেড়ে দিলেন।

এখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জেনারকে সম্মানিত করতে থাকল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট জেনারের পরীক্ষার জন্য তিরিশ হাজার পাউণ্ড মঞ্জুর করল। ভারতবর্ষ একলক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিল। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, যে তারিখে জেনার জেম্স ফিলিপ্‌কে প্রথম টিকা দিলেন জার্মানি প্রতি বছর সেই তারিখটি একটা জাতীয় পর্বদিন হিসাবে ধার্য করল। এসবের মধ্যে একটা হাস্যকর ব্যাপার রয়ে গেল। ইংলণ্ডের রয়াল কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস স্থির করলেন যে, জেনার যতদিন না গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় পরীক্ষা পাস করেন, ততদিন তাঁকে ওই প্রতিষ্ঠানের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হবে না। জেনার পরীক্ষা দিতে অস্বীকার করলেন।

জেনার তাঁর আবিষ্কারের পদ্ধতি কোনদিন গোপন রাখলেন না। পৃথিবীর নানা স্থান থেকে নানা প্রশ্ন আসতে লাগল, তিনি যথাযথভাবে সকল কথা বুঝিয়ে দিতে থাকলেন। অনেক দেশ আইন করে টিকা নেওয়াটা বাধ্য করল। এরপর বসন্ত রোগে মৃত্যু পৃথিবীতে আর বড় দেখা গেল না। তাই কয়েক বছর আগে ইংলণ্ডের একটি বন্দরে একজন নাবিকের বসন্ত হবার সংবাদ যেই প্রকাশিত হল অমনি চারিদিকে এক ভীষণ সোরগোল পড়ে গেল। আর এই আবিষ্কারের একশ' বছর আগে ইংলণ্ডের রাণী মেরী যখন এই বসন্ত রোগে মারা যান, তখন সেই সময়ে ইংলণ্ডের অবস্থা সম্বন্ধে মেকলে এই রকম বর্ণনা দিয়েছেন—

প্লেগ অনেক লোককে নাশ করে চলে গেল বটে, কিন্তু আমাদের জীবদ্দশায় প্লেগ মাত্র একবার দু'বার এসেছে। বসন্ত যেন বারোমেসে ব্যাপার। কবরস্থানে মড়ার পর মড়া আসছে। প্রত্যেকে ভয়ে অস্থির, কাকে কখন ওই রোগ ধরে। রোগের আক্রমণ থেকে যারা উঠল, তাদের দেহ কি ভয়ংকর হল!

বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে অভিযানে বিজ্ঞান জয়ী হল, আর সে অভিযানের নেতা ছিলেন জেনার।

* **অনুশীলনী**

১। বাংলা টিকা ও ইংরেজী টিকার তফাত কি?

২। বাংলা টিকার দোষ-গুণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। ইংরেজী টিকা কিরূপে সৃষ্টি হইল। ইহার ফলাফল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ ঃ

৪। গো-বসন্ত কাহাকে বলে? উহার ফলাফল কি?

৫। টীকা লিখ ঃ লেডি মণ্টেগু ; নেলমিস ; নেপোলিয়ন ; রাণী মেরী।

Story of the invention of the vaccine Small pox by Dr Jenner.

বাঙালী মহাজ্ঞানী



কালিদাস রায়

বাংলায় তখন পাল আমল। রাজা মহীপালদেব বসেছেন সিংহাসনে। এমন দিনে উদয় হলেন আর একজন মহাজ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

কেউ কেউ বলেন, গৌড়ের এক রাজার ছেলে ছিলেন তিনি। কেউ বা বলেন তাঁর বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের বিক্রমনীপুরে। এখন তার নাম বিক্রমপুর। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী বলে এক গ্রাম আছে। সেই গ্রামের মানুষ এখনও একটা ভিটে দেখিয়ে বলে, ঐ যে আমাদের নাস্তিক-পণ্ডিতের ভিটে। নাস্তিক-পণ্ডিত কেন বলে জান? তিনি বৌদ্ধ ছিলেন তাই।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের আগেকার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। চন্দ্রগর্ভ বড় হলেন, অনেক শাস্ত্র পড়লেন। তখন বাঙলার বাইরের নালন্দা, কৃষ্ণগিরি, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা আর বাংলার সোমপুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব নাম ডাক। চন্দ্রগর্ভ কৃষ্ণগিরিতে পড়াশোনা করলেন, ওদন্তপুরীতে হল তাঁর দীক্ষা। এবার চন্দ্রগর্ভ নাম ঘুচে গেল, তিনি হলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তার মানে—জ্ঞানের দীপশিখা যিনি জ্বালিয়ে রাখেন।

যত পড়েন দীপঙ্কর, তত যেন জানবার ইচ্ছা বেড়ে যায়। শেষে ঠিক করলেন, তিনি জ্ঞানের সন্ধানে যাবেন ভারতের বাইরে।

ভারতের বাইরে মালয় উপদ্বীপ। একদিন ভারত থেকে মানুষ গিয়ে সেখানে বসতি গড়েছিল। তার নাম তখন সুবর্ণভূমি বা সুবর্ণ-দ্বীপ। সেই সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধশাস্ত্রের খুব চর্চা হোত। দীপঙ্কর একদিন সেখানেই চললেন। বারোটি বছর কেটে গেল। এবার শিক্ষা শেষ করে সিংহলের পথে ফিরে এলেন বাংলায়। রাজা মহীপাল তাঁকে আদর করে ডেকে এনে বিক্রমশীলার বিহারের মহাচার্য পদে বসিয়ে দিলেন।

বিহারে আছেন, বিদ্যা শিক্ষা দেন, দেশী আর ভিনদেশী মহাজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। এমনি করেই দিন কেটে যায়। একদিন এমন সময় এল নিমন্ত্রণ। হিমালয়ের পরপারে তিব্বত—সেই তিব্বতের রাজার নিমন্ত্রণ। দূতের মুখে রাজা বলে পাঠালেন, তাঁর দেশে বৌদ্ধধর্ম লোপ পেতে বসেছে। সে ধর্মকে আবার নতুন করে জাগিয়ে তুলতে পারেন একমাত্র মহাজ্ঞানী দীপঙ্কর। তিনি যদি তাঁর দেশে আসেন তো বড় ভাল হয়।

দীপঙ্কর যেতে রাজী হলেন না। দূত নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

দিন যায়। বুড়ো হয়ে পড়েছেন দীপঙ্কর।

এখন তাঁর সত্তর বছর বয়স। একদিন তিব্বত থেকে আবার এল দূত। কি খবর ?

রাজা মারা গেছেন। কিন্তু মরবার সময় শেষ প্রার্থনা জানিয়ে গেছেন, দীপঙ্কর যেন একবার তাঁর দেশে আসেন—যেন দেশকে অধর্মের হাত থেকে বাঁচান।

দীপঙ্কর আর বসে থাকতে পারলেন না। সত্তর বছর বয়সেই তিনি রওয়ানা হলেন তিব্বতের পথে। সঙ্গে তাঁর কয়েকজন মাত্র শিষ্য।

তখন দেশে না ছিল ষ্টীমার ; না ছিল রেল আর উড়োজাহাজ। বিক্রমশীলা বিহার ছিল এখনকার বিহার প্রদেশে, সেখান থেকে পায়ে হেঁটেই রওয়ানা হলেন। কত নদ-নদী, বন-জঙ্গল পার হয়ে চললেন। তারপরে এল হিমালয় পর্বতের দেশ। সে-পর্বতে একজন সঙ্গী মারা গেলেন। আবার দু-দুবার ডাকাতের দল এসে হানা দিলে। কিন্তু দীপঙ্কর তো ভয় পান না। তিনি চলতে লাগলেন। তারপর একদিন এসে পৌঁছলেন তিব্বতে। সেখানে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করলেন। জ্ঞানের শিখা জ্বালিয়ে তুললেন সেই অজ্ঞান

দেশে, তাঁর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নাম সার্থক হ'ল। তিনি তিব্বতীদের জ্ঞান দিলেন, তারা হল সভ্য। তাই আজও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতের লোকেরা দেবতা বলে পূজা করে।

* অনুশীলনী

১। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের আগেকার নাম কি ছিল? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর আবির্ভাব কালে বাংলাদেশে কোন্ রাজারা রাজত্ব করিতেন? দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামের প্রকৃত অর্থ কি?

২। কোন্ কোন্ জায়গায় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন?

৩। তিব্বতীরা আজও কেন শ্রীজ্ঞান দীপঙ্করকে দেবতা বলে পূজা করে?

৪। অর্থ লিখ: মহাচার্য; নিরাশ; অজ্ঞান; মহাজ্ঞানী; সার্থক।

৫। টীকা লিখ: কৃষ্ণগিরি; সুবর্ণদীপ; মহীপাল।

Life, learning and fame of Dipankar Shri jnana.



অজানা দেশের সন্ধানে

জয়দেব রায়

আফ্রিকা মহাদেশে সাহারা নামে ভীষণ মরুভূমির দক্ষিণে নাইগার নামে একটি নদী আছে। এই নদীটি কোন্ পথ দিয়ে কোথায় সমুদ্রে পড়েছে, তার সন্ধান দেড়শত বৎসর আগে কেউ জানত না। মঙ্গো পার্ক নামে স্কটল্যাণ্ডের এক যুবক ডাক্তার এই নদীপথ আবিষ্কারের ভার নিয়েছিলেন। তাঁর আগে কেউবা কাফ্রিদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন—কেউ কেউ হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিলেন।

পার্ক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার জঙ্গলের দুর্গম পথে যাত্রা করলেন। বন্য কাফ্রিদের ভোলাবার জন্যে তিনি সঙ্গে অনেক রঙিন খেলনা, খাদ্যদ্রব্য, মদ, তামাক ইত্যাদি নিলেন। নিজে কাফ্রিদের ভাষা কিছু কিছু শিখে নিলেন।

নাইগার নদীতে পৌঁছাবার আগে পার্ককে কাফ্রিদের লোকালয়ে বহুদিন কাটাতে হয়েছিল। কোথাও কোথাও তিনি ভাল ব্যবহার পেয়েছিলেন, অধিকাংশ স্থানে তাঁর দুর্গতির অবধি ছিল না।

কাফ্রিরা সাদা মানুষ কখনও দেখে নাই—পার্কের গায়ের রঙ আসল কি নকল দেখবার জন্য কোন কোন কাফ্রি ঘষে ঘষে তাঁর গায়ের চামড়া তুলে ফেলবার যোগাড় করল। আবার কোথাও কোথাও তাঁকে দেবতা বলে পূজা করতে লাগল।

পার্ক কোথাও কোথাও রঙিন খেলনা ও পুতুল ঘুষ দিয়ে তাদের বশীভূত

করলেন। এক গ্রামের রাজা পার্কের ছাতা ও কোটটি কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিল। পার্ককে খালি গায়ে খালি মাথায় পথ চলতে হয়।

এক স্থানে কাফ্রিরা পার্কের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিল। তারপর পার্ককে মানুষ-খেকো অসভ্যদের মাঝ দিয়ে যেতে হল। দিনের বেলায় তিনি জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতেন। গভীর রাত্রে তারা ঘুমোলে তিনি পথ চলতেন। মানুষের হাত থেকে কোন প্রকারে রক্ষা পেলেন, কিন্তু বন্য জন্তুর মুখে তাঁর প্রাণ যাবার উপক্রম হল। কতবার সিংহের মুখে পড়ে তিনি দৈবক্রমে বেঁচে গিয়েছেন, গণ্ডারে কতবার তাড়া করেছে, আঁকাবাঁকা পথে ছুটে তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। বেবুন নামক বানরের দল কতবার তাঁকে ঘিরে আধমরা করে ছেড়ে দিয়েছে তার সংখ্যা নেই।

বনের পথে যেতে যেতে তিনি দেখলেন, সার বেঁধে হাতীর দল চলছে—ফাঁকা জায়গায় জেব্রা, জিরাফ, হরিণ নিশ্চিন্ত হয়ে লতাপাতা খাচ্ছে, এমন সময় একপাল সিংহ এসে তাদের উপর পরে ভোজনের উৎসবে মেতে গেল। গাছের উঁচু ডালে বসে পার্ক সেই দৃশ্য দেখে কাঁপতে লাগলেন।

তৃষ্ণায় কাতর হয়ে অনেক সন্ধানের পর হয়তো তিনি একটি হ্রদের সন্ধান পেলেন, জলপান করতে গিয়ে দেখলেন—দলে দলে কুমীর ও হিপোপোটেমাস ছুটে আসছে। জলপান দূরে থাকুক, প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তাকে ছুটে পালাতে হল।

হঠাৎ একদিন একদল মুর সৈন্য এসে তাঁকে বন্দী করল। তারা তাঁকে একবিন্দু জল পর্যন্ত দিল না, শেষে তাঁর প্রাণদণ্ডের হুকুম হল। ভাগ্যক্রমে এই সময়ে একদল শত্রু এসে মুরদের আস্তানা আক্রমণ করল। সেই সুযোগে পার্ক পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন।

এইভাবে চলতে চলতে পার্ক একদিন নদীটির সন্ধান পেলেন। সত্তর মাইল ধরে পার্ক নদীর ধারে ধারে চললেন। নদীর মোহনা এখনও কতদূর কে জানে? পার্ক পথে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন; এক বুড়ো কাফ্রি গোলামের সেবায় সেবার তিনি রক্ষা পেলেন এবং অতিকষ্টে দেশে ফিরলেন।

আট বৎসর পরে ৪৫ জন সঙ্গী নিয়ে পার্ক আবার ঐ নদীর মোহনার

খেঁাজে বের হলেন। এবার নদীর কূলে পৌছবার আগেই ৪৫ জন সঙ্গীর মধ্যে ৩৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হল। ১২ জন সঙ্গীসহ তিনি নদীতে নৌকা ভাসালেন। ১০০ মাইল অতিক্রম করতে না করতে আরও পাঁচজনের মৃত্যু হল, পার্ক তবু ফিরলেন না।

কিছুদিন পরে ডুবো পাহাড়ে তাঁর নৌকা ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে গেল। ভাঙ্গা নৌকা মেরামতের জন্য তিনি বাধ্য হয়ে ডাঙ্গায় উঠলেন। একদল কাফ্রি এসে সেই সময়ে তাঁদের আক্রমণ করল। পার্ক ও তাঁর সঙ্গিগণ প্রাণপণে লড়াই করে নিহত হলেন। পার্কের মৃতদেহ নাইগারের স্রোতে ভেসে গেল।

যে নদী-মোহনার সন্ধানে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করলেন, জীবন্ত অবস্থায় তিনি সেখানে পৌছতে পারলেন না। শেষে তাঁর মৃতদেহটি যেন তারই সন্ধানে ভেসে চলল।

* অনুশীলনী

১। অর্থ বল ও বাক্য রচনা কর :
সন্ধান, হতাশ, সদ্ব্যবহার, যথাসর্বস্ব, আত্মরক্ষা, উৎসর্গ।

২। বিপরীত শব্দ লিখ :
সদ্ব্যবহার, ফাঁকা, বন্দী, জীবন্ত, শত্রু।

৩। প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(ক) নাইগার নদীটি কোথায় অবস্থিত ?

(খ) পার্ক আফ্রিকার জঙ্গলে যাইবার জন্য কিভাবে তৈরী হইলেন ?

(গ) নাইগার নদীতে পেঁাছিবার আগে কাফ্রিদের হাতে পার্ক কিভাবে নিগৃহীত হইয়াছিলেন ?

(ঘ) আফ্রিকার জঙ্গলে পার্ক বন্য জন্তুদের হাত হইতে কি ভাবে রক্ষা পাইয়াছিলেন ?

(ঙ) মুর সৈন্যদের হাতে কি ভাবে তিনি বন্দী ও মুক্ত হন ?

(চ) ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া পার্কের নৌকা ভাঙিয়া গেলে তাঁহার অবস্থা কি হইল লেখ।

৪। শূন্যস্থানে শব্দ বসাও ঃ

(ক) এক স্থানে—পার্কের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিল।

(খ) গভীর রাত্রে তারা – তিনি পথ চলতেন।

(গ) হঠাৎ একদিন একদল – সৈন্য এসে তাঁকে বন্দী করল।

(ঘ) পার্কের – নাইগারের স্রোতে ভেসে গেল।

(ঙ) শেষে তাঁর – দেহটি যেন তারই সন্ধানে ভেসে গেল।

৫। আফ্রিকার জঙ্গলের বন্য জন্তুদের একটি তালিকা তৈয়ারী কর।

৬। শিশুসাথী, কিশোরভারতী, সন্দেশ, শুকতারা পত্রিকায় আফ্রিকার জঙ্গলের অনেক খবর থাকে। ঐসব পত্রিকা সংগ্রহ করে পড়।

———

Description of the experience of Mango Park, the discover of the Niger's course.

দশরথের উপদেশ

কৃত্তিবাস ওঝা

পিতা পুত্রে বসিলেন সিংহাসন 'পরে।
পাত্রমিত্র সকলে বেষ্টিত নৃপবরে ॥
নক্ষত্রবেষ্টিত হন পূর্ণ-শশধর।
সেই মত শোভিত হইল রঘুবর ॥
পুত্রেরে শিখান বিদ্যা সভা-বিদ্যমান।
রাজনীতি, ধর্ম, আর বিবিধ বিধান ॥
প্রথমা রাণীর তুমি প্রথম নন্দন।
ভূপতি হইয়া কর প্রজার পালন ॥
লোকের রঞ্জন তুমি করিহ যতনে।
তোমার মহিমা যেন সর্বত্র বাখানে ॥
রাজনীতি, ধর্ম, তুমি শিখ সাবধানে।
যাহাতে মহিমা যশঃ বাড়ে দিনে দিনে ॥
পর হিংসা, পর পীড়া না করিহ মনে।
কভু না করিহ রাম লোভ পর ধনে ॥
শরণ লইলে শত্রু করো পরিত্রাণ।
অপরাধ বিনা কারো না লইও প্রাণ ॥
দরিদ্রের ভরণ করিও চিরদিন।
আদর করিও তারে জ্ঞানে যে প্রবীণ ॥

আচার, বিনয়, বিদ্যা, ধর্মবল আর।
আছে যার, মানে তারে সকল সংসার॥
অবিনয়ী অবিবেকী রাজা যদি হয়।
দীন হতে দীন দেখ নাহিক সংশয়॥

* অনুশীলনী

১। রামচন্দ্রের প্রতি দশরথের উপদেশগুলি নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।

২। "প্রথমা রাণীর তুমি প্রথম নন্দন।
ভূপতি হইয়া কর প্রজার পালন।"

(ক) উক্তিটি কাহার?

(খ) প্রথমা রাণী কে?

(গ) প্রথম নন্দন বলিতে কাহাকে বুঝান হইয়াছে?

৩। দশরথ পুত্রকে কী কী বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন?

৪। অবিনয়ী ও অবিবেকী ব্যক্তি রাজা হইলে তাহার কিরূপ পরিণাম হয়?

৫। অর্থ লিখ ঃ শশধর; নক্ষত্রবেষ্টিত; রঞ্জন; বাখানে; পরিত্রাণ; সংশয়

———

one good qualities of an ideal king

বিদ্যাসাগর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু !—উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা-পর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে।
দানে বারি নদীরূপা বিমলা কিঙ্করী,
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু দল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুল-কুল দশ বিশ ভরে;
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।

* অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ বল।

২। 'করুণার সিন্ধু' ও 'দীনের বন্ধু' বলিতে কবি কাহাকে বুঝাইতেছেন?

৩। অর্থ লিখঃ উজ্জ্বল; হিমাদ্রি; হেম-কান্তি; অম্লান; গিরীশ; কিঙ্করী; পরিমল; বনেশ্বরী; সুশান্ত।

Vidyasagar's qualities and greatness have compared to those of the Himalayas.

আমার সোনার বাংলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে
বাজায় বাঁশি
ওমা, ফাল্গুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
কী শোভা কী ছায়া গো, কী স্নেহ কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা তোর বদনখানি মলিন হলে, ওমা, আমি নয়ন জলে ভাসি
তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে—
তোমার ধূলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে—
তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, ওমা, তোমার কোলে ছুটে আসি।।
ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়া ঘাটে,
সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায় ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
মরি হায়, হায় রে—
ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ওমা তোমার রাখাল
তোমার চাষী।।

* অনুশীলনী

১। 'সোনার বাংলা' কবির কাছে এত প্রিয় কেন ?

২। শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর ঃ

(ক) তোমার এই — শিশুকাল — রে —
— ধূলামাটি অঙ্গে — ধন্য জীবন — ।

(খ) ধেনু-চরা তোমার —, পারে যাবার — ঘাটে,
— পাখি-ডাকা ছায়ায় — তোমার —,
তোমার ধানে-ভরা —জীবনের — কাটে,
মরি —, — রে —
ওমা, — যে ভাই — সবাই, — তোমার — তোমার — ।

৩। বিশেষণ পদগুলির নীচে দাগ দাও ঃ

(ক) 'ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ।'

(খ) 'মা তোর বদনখানি মলিন হলে, ওমা, আমি নয়ন জলে, ভাসি ।'

৪। শুদ্ধ শব্দগুলির পাশে (✓) চিহ্ন দাও ঃ

বাঁশি	বাঁশী	মলীন	মলিন
মধুর	মধূর	ধেনু	ধেনূ
বাণী	বাণি	চাষি	চাষী

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ লিখ ঃ

মূল : দীন ; দীপ ।

Glorification of Bengal.

বঙ্গভাষা

অতুলপ্রসাদ সেন

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ-মরি বাংলা ভাষা!
(ওগো) তোমার কোলে তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালোবাসা!
কি যাদু বাংলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
ঐ ভাষাতেই নিতাই-গোরা
আনল দেশে ভক্তি-ধারা;
আছে কই এমন ভাষা
এমন দুঃখ ক্লান্তি নাশা।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনল মালা জগৎ জিনে;
তোমার চরণ-তীর্থে মাগো,
জগৎ করে যাওয়া আসা।
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে,
ডাকনু মায়ে মা মা বলে,
ঐ ভাষাতেই বলব হরি,
সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা।

* অনুশীলনী

১। বঙ্গভাষাকে কবি 'মোদের গরব, মোদের আশা' বলিয়াছেন কেন ?

২। নিতাই-গোরা বলিতে কাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে ? তাঁহাদের পরিচয় দাও।

৩। "বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনল মালা জগৎ জিনে"—
এই দুইটি পঙক্তির অর্থ নিজের ভাষায় গুছাইয়া লিখ।

৪। অর্থ লিখ ঃ গরব ; যাদু ; ধারা ; জিনে ; ক্লান্তিনাশা ; চরণ-তীর্থে।

৫। 'ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে'—এখানে ঐ ভাষা কোন্ ভাষা ?

৬। 'সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা'—এ কথার অর্থ কি ?

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
ঐ — প্রথম বোলে
— মায়ে মা মা —,
ঐ — বলব —,
— হলে, —হাসা।

———

Glorification of Bengali Langu

বাংলা দেশ

সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত

কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চলতে গেলেই দল্‌তে হয় রে দূর্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল—সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ—আমাদেরি বাংলা রে!

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা—ফিঙ্গে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ—আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ ভাষা মরমে পশি'—আকুল করি তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুনতে পা'ব বাউল সুরে মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের, রামপ্রসাদের কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ—আমাদেরই বাংলা রে ?

কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা—সবার অধিক পাই রে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায় বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃপিতামহের চরণধূলি কোথায় রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ—আমাদেরই বাংলা রে !

* অনুশীলনী

১। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা দেশের যে চিত্রটি অংকন করিয়াছেন, তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

২। কবিতাটিতে কবির দেশপ্রেমের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা আলোচনা কর।

৩। বাংলাদেশকে আমরা কেন ভালোবাসি তাহা নিজের ভাষায় বুঝাইয়া দাও।

৪। অর্থ লিখ ও বাক্য রচনা কর ঃ তরুলতা ; শ্যামল ; কোমল ; আকুল।

৫। টীকা লিখ ঃ মরাল-মরালী ; চাতক ; চণ্ডীদাস ; রামপ্রসাদ।

৬। 'বাংলা দেশ' কবিতায় বাংলাভাষা সম্বন্ধে নিজের বক্তব্যটি কবির ভাষায় পরিস্ফুট কর।

———

Characteristics and glories of Bengal

দেখব এবার জগৎটাকে

—কাজী নজরুল ইসলাম

থাকব নাক' বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন ক'রে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণীপাকে,
দেশ হ'তে দেশ-দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন ক'রে।
কিসের নেশায় কেমন ক'রে মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় কর্‌ছে তা'রা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে।
কেমন ক'রে বীর ডুবুরি সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনে,
কেমন ক'রে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গপানে।
জাপটে ধ'রে ঢেউয়ের ঝুঁটি যুদ্ধ-জাহাজ চলছে ছুটি'—
কেমন ক'রে আনছে মানিক বোঝাই ক'রে সিন্ধু-যানে,
কেমন ক'রে টানলে সাগর উথ্‌লে উঠে জোয়ার বাণে।
কেমন ক'রে মথ্‌লে পাথার লক্ষ্মী উঠেন পাতাল ফুঁড়ে।
কিসের অভিযানে মানুষ চলছে হিমালয়ের চুড়ে,
তুহীন-মেরু পার হয়ে যায় সন্ধানীরা কিসের আশায়?
হাউই চড়ে' চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিনপুরে,
শুনব আমি ইঙ্গিতে কোন্ মঙ্গল হাতে আস্‌ছে উড়ে!
রইব নাক' বদ্ধ খাঁচায় দেখ্‌ব এ সব ভুবন ঘুরে,
আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, তারায়, সাগর-জলে, পাহাড় চুড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে দশদিকেতে পড়ব লুটে,
পাতাল ফেঁড়ে নামব আমি, উঠ্‌ব আমি আকাশ ফুঁড়ে,
বিশ্বজগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

* **অনুশীলনী**

১। নীচের দাগ দেওয়া শব্দগুলির অর্থ লিখ ঃ

(ক) কেমন করে বীর ডুবুরি সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনে।

(খ) কেমন ক'রে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গপানে।

(গ) হাউই চড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিনপুরে।

(ঘ) কেমন করে আনছে মানিক বোঝাই করে সিন্ধু-যানে।

২। 'থাকব নাক বন্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে'।—কি কি দেখিবে সেগুলি গদ্যাকারে নিজ ভাষায় লিখ।

৩। প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

(ক) কে সিন্ধু সেঁচিয়া মুক্তা আনে ?

(খ) কে স্বর্গপানে উড়িয়া চলে ?

(গ) কাহারা তুহিন-মেরু পার হইয়া যায় ?

৪। 'হাউই চড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিনপুরে'—চন্দ্রলোকে কেউ হাউই চড়িয়া গিয়াছেন কি ?

৫। যেটি শুদ্ধ তার পাশে (✓) চিহ্ন দাও ঃ

(ক) 'কেমন ক'রে দুঃসাহসী সিন্ধ সেঁচে মুক্তা আনে।'

(খ) 'কেমন ক'রে বীর ডুবুরি চলছে উড়ে স্বর্গপানে।'

(গ) 'কেমন ক'রে বীর ডুবুরি সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনে।'

(ঘ) 'কেমন ক'রে দুঃসাহসী চল্‌ছে উড়ে স্বর্গপানে !'

———

Aims and ambitions of an eternal adven mind !

হাতগণনা

সুকুমার রায়

ও পাড়ার নন্দগোঁসাই, আমাদের নন্দখুড়ো,
স্বভাবেতে সরল সোজা অমায়িক শান্ত বুড়ো।
ছিল না তার অসুখ-বিসুখ, ছিল যে মনের সুখে,
দেখা যেত সদাই তারে হুঁকো হাতে হাস্যমুখে।
হঠাৎ কি তার খেয়াল হল, চলল সে তার হাত দেখাতে,
ফিরে এল শুকনো সরু—ঠকাঠক্ কাঁপছে দাঁতে।
শুধালে সে কয় না কথা, আকাশেতে রয় সে চেয়ে,
মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে, পড়ে জল চক্ষু বেয়ে।
শুনে লোকে দৌড়ে এল, ছুটে এলেন বদ্যিমশায়,
সবাই বলে, কাঁদছ কেন? কি হয়েছে নন্দগোঁসাই?
খুড়ো বলে, বলব কি আর হাতে আমার স্পষ্ট লেখা
আমার ঘারে আছেন শনি, কাঁটায় ভরা আয়ুর রেখা।
এতদিন যায়নি জানা ফিরছি কত গ্রহের ফেরে—
হঠাৎ আমার প্রাণটা গেলে তখন আমায় রাখবে কেরে?
ষাটটা বছর পার হয়েছি বাপকাকাদের পুণ্য ফলে—
ওরে তোদের নন্দখুড়ো এবার বুঝি পটোল তোলে।
কবে যে কি ঘটবে বিপদ কিছু হায় যায় না বলা—
এই বলে সে উঠল কেঁদে ছেড়ে ভীষণ উচ্চ গলা।
দেখে এলাম আজ সকালে গিয়ে ওদের পাড়ার মুখো,
বুড়ো আছে নেইকো হাসি, হাতে তার নেইকো হুঁকো।

*** অনুশীলনী**

১। কবিতাটির সার-সংক্ষেপ নিজের ভাষায় লিখ।

২। (ক) নন্দখুড়োর স্বভাব কেমন ছিল?

(খ) হাত দেখানোর পর নন্দখুড়োর অবস্থা কি হইয়াছিল?

(গ) নন্দখুড়োর উঁচু গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিবার কারণ কি?

৩। 'দেখে এলাম আজ সকালে'—কবি নন্দখুড়োকে কী অবস্থায় দেখিয়া আসিলেন?

৪। কোন্‌টি কি পদ লিখঃ অমায়িক; শান্ত; শুকনো; শিউরে; বদ্যিমশাই; পুণ্য; বিপদ; ভীষণ।

৫। শুদ্ধ বানানগুলির পাশে (✓) চিহ্ন বসাওঃ

সভাব	স্বভাব
অসুখ	অসুখ
হঠাত	হঠাৎ
সরু	সরু
ভীষণ	ভিষণ

৬। বিপরীত শব্দ লিখঃ সোজা; সুখ; শুকনো; সরু; পুণ্য।

———

Humourous situation of the reaction of superstition!

পূজার দিনে

শ্রীকালিদাস রায়

গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ। আজ মহানবমীর দিন
চলিলাম মাঠপথে—দেখি পদে মোদের নবীন
আখ-খেতে আলে বসে একমনে কাটিতেছে ঘাস।
নবীন গরীব বড়, ফেলিলাম ব্যথার নিশ্বাস।
নিমন্ত্রণ সারি এসে দেখিলাম সেইখানে চেয়ে
নবীন তখনো সেথা ঘাস কাটে গান গেয়ে গেয়ে।
বলিলাম, "বাবা নবু, বারো মাসই ঘাস তুমি কাটো!
আমোদ কর না আজ—শুভদিনে কেন আর খাটো?
সবাই নিয়েছে ছুটি—কাজ বন্ধ এই তিন দিন
সারা দিন ঘাস কেটে আজো তুমি কাটাবে নবীন?"
নবীন বলিল—"কত্তা, যা বলিলে সন্দ নেই তায়,
আজকের পূজার দিনে সকলেই ভাল পরে খায়,
পাবে না গোরুটি মোর ভাল ক'রে পেট ভ'রে খেতে?
দুর্বল অবোলা জীব সাধ তার যায় না-কি এতে,
আপনি বলুন কত্তা?" আমি ভূরিভোজনে কাতর
দেহটি লইয়া ফিরে আসিলাম গৃহে নিরুত্তর।

*** অনুশীলনী**

১। (ক) কবি নবীনকে দেখিয়া 'ব্যথার নিশ্বাস' ফেলিলেন কেন?
(খ) নবীনকে কবি কি বলিলেন, বল।
(গ) পূজার দিনেও নবীন কেন কাজ বন্ধ রাখিতে রাজী হইল না, বল।
(ঘ) কবি কেন 'নিরুত্তর' হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন?

২। নবীনের চরিত্রটি তোমার কেমন লাগে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর।

৩। কবিতাটি পড়িয়া কী বুঝিলে তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

৪। নিজে নিজে বাক্য রচনা কর: ব্যথার নিশ্বাস; শুভ দিনে; অবোলা; ভূরিভোজন; কাতর।

৫। পদ নির্ণয় কর: নিমন্ত্রণ; নিশ্বাস; গরীব; দেখিলাম; দুর্বল; অবোলা।

Love for the domestic animal!

ছাত্র সঙ্গীত

শ্রীকালিদাস রায়

মোরা—গাহি সত্যের জয়,
সদা বরিব সত্যে, স্মরিব সত্যে, দূরিব মিথ্যা ভয় ॥
সহি'—সকল দুঃখতাপ মোরা—ঘুচাব ভ্রান্তিপাশ,
মোরা—বরিয়া বেদনা তপের সাধনা মুছাব জাতীয় শাপ।
মোরা—শির পাতি' ল'ব সকল দণ্ড অপরাধ যদি হয় ॥
মোরা—রাখিতে ন্যায়ের মান হেসে—সকলি করিব দান,
মোরা—ভোগবিলাসের শফরী-লীলায় হ'ব না মুহ্যমান।
হীন—স্বার্থের সাথে মনুষ্যত্ব করিব না বিনিময় ॥
হীন—জীবন-সমরে শূল, হীন—জড়তা করিব দূর,
মোরা—হেরি' মিথ্যার আপাত-বিজয় হ'ব না শঙ্কাতুর।
মোরা—রুদ্রের শূলে ভয় করিব না, কেড়ে ল'ব বরাভয় ॥

* **অনুশীলনী**

১। 'ছাত্র-সঙ্গীত' কবিতায় ছাত্রসমাজের যে প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

২। ব্যাখ্যা লিখ :—

মোরা—রাখিতে ন্যায়ের মান হেসে—সকলি করিব দান,
মোরা—ভোগবিলাসে শফরী-লীলায় হ'ব না মুহ্যমান।
হীন—স্বার্থের সাথে মনুষ্যত্ব করিব না বিনিময়।

৩। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ : জয় ; মিথ্যা ; ভয় ; জড়তা ; শঙ্কাতুর।

Aims and objectives of the Students in general.

আমার বাড়ী

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাড়ী আমার ভাঙ্গন-ধরা অজয় নদীর বাঁকে,
জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।
সামনে ধূসর বেলা জলচরের মেলা।
সুদূর গ্রামের ঘর দেখা যায় তরুলতার ফাঁকে ॥

ঠিক দুপুরে বাতাস লেগে নাচে জলের ঢেউ,
আমি দেখি আপন মনে, আর দেখে না কেউ।
জেলেরা দেয় বাঁচ লাফায় বোয়াল মাছ,
নীরব আকাশ মুখর করে শঙ্খচিলের ডাকে ॥

ভাঙ্গা বাড়ীর ভাঙ্গা ঘাটে আছড়ে পড়ে জল,
মেঠো ফুলের মিঠা বাসে মন করে চঞ্চল।
যত দূরই চাই, শোভার সীমা নাই,
পল্লীবধূ কলসী ভ'রে জল লয়ে যায় কাঁখে ॥

মাধবী যূই মালতীতে ঘেরা উঠান মোর,
আমের গাছে কোকিল ডাকে দিবস নিশি ভোর।
দোয়েল পাপিয়ায় গানে কানন ছায়
চক্র রচে মৌমাছিরা নিত্য ঝাঁকে ঝাঁকে ॥

অনুশীলনী

১। অজয় নদীর তীরের প্রাকৃতিক বর্ণনা দাও।

২। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

৩। কবি বলিয়াছেন—"আমি দেখি আপন মনে আর দেখে না কেউ"—
এই কথাটির সার্থকতা কি?

৪। বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর : –

(ক) 'ঠিক দুপুরে বাতাস লেগে...... না কেউ।'

(খ) 'মেঠো ফুলের মিঠা বাসে মন করে চঞ্চল॥'

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) 'নীরব আকাশ -- করে — ডাকে।।"

(খ) 'পল্লীবধূ — ভ'রে — লয়ে যায় কাঁখে।'

(গ) আমের গাছে — ডাকে — নিশি ভোর।'

৬। অর্থ লিখ ও বাক্য রচনা কর :—

সোহাগ, তরুলতা, পল্লীবধূ, চক্র, নিত্য।

৭। 'আমার বাড়ী' কবিতাটিতে কবি তাঁহার নিজ গ্রামের কথা বলিয়াছেন। তোমার গ্রামের নিকটে কোন নদী থাকিলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ তোমার সহপাঠীকে বল।

eautiful and attractive
Surroundings of the house or residence
of a typical Indian villager.

সবার আমি ছাত্র

—সুনির্মল বসু

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হ'তে ভাই রে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাই রে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান   হই যেন ভাই মৌন মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে প্রাণ-খোলা হই ভাই রে।

তপন আমায় মন্ত্রণা দেয় আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখালো হাসতে মিঠে, মধুর কথা বলতে।
ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর   অন্তর হোক রত্ন-আকর
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম আপন বেগে চলতে॥

মাটির কাছে সহিষ্ণুতার পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হ'তে পাষাণ দিল দীক্ষা।
ঝরনা তাহার সহজ তানে   গান জাগালো আমার প্রাণে,
শ্যাম বনানী সরসতা আমায় দিল ভিক্ষা।

বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র,
নানা ভাবের নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়   পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়,
শিখছি সে সব, লজ্জা দ্বিধা নেইক কণামাত্র।

অনুশীলনী

১। প্রকৃতির পাঠশালায় কবি যে শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহা নিজের ভাষায় লেখ।

২। যথার্থ উত্তরগুলির নীচে দাগ দাও :—

প্রঃ কবিকে উদার হইতে শিক্ষা দিল কে?

উঃ বায়ু/ আকাশ।

প্রঃ কর্মী হইবার মন্ত্র কবি কাহার নিকট হইতে পাইয়াছেন?

উঃ আকাশের / বায়ুর / খোলা মাঠের।

প্রঃ আপন তেজে জ্বলিতে কবিকে কে মন্ত্রণা দেয়?

উঃ চাঁদ / নদী / তপন।

প্রঃ কাহার নিকটে কবি আপন বেগে চলিতে শিক্ষা পাইলেন?

উঃ নদীর / চাঁদের / মাটির।

প্রঃ কাহার কাছে কবি সহিষ্ণুতার শিক্ষালাভ করেন?

উঃ পাহাড় / নদী / মাটি / পাষাণ।

৩। নিম্নলিখিত পদগুলিকে স্ব স্ব স্থানে সাজাও :—

বিশেষ্য	বিশেষণ
মৌন	কঠোর
মহান	সরসতা
সহিষ্ণুতা	উদার
বিরাট	পাঠশালা
নতুন	জিনিস

Natural objects by their own functions teach us some good qualities.

জাতীয় পতাকা

মনোজিৎ বসু

তিন রঙে-আঁকা জাতীয় পতাকা আজিকে তোমার প্রতি
নব-ভারতের স্বাধীন জনতা জানাল শ্রদ্ধা নতি
অশোকচক্র– লাঞ্ছিত নব-তুমি যে নিশানরাজ
তব জয়গান গাহিয়া গরজে অযুত বিষাণ আজ।
প্রাসাদে কুটীরে দুর্গ কারায় গৌরবে উড্ডীন,
জানাবো বিশ্ববাসীরে আমরা আর নহি পরাধীন।
প্রাণ দিলো কত মুক্তি সাধক জাতির পতাকা তরে,
মরণ কালেও ঐ মহা-কেতন হাত হ'তে নাহি পড়ে।
স্বাধীনতা-রণে তিন রঙে রাঙা জাতীয় পতাকাখানি,
মুক্তি-সেনার অন্তরে নব প্রেরণা দিয়েছে আনি।
জাতি ধর্মের নাহি ভেদাভেদ নাহি অপমান লাজ
এ মহা-নিশান জনকল্যাণ সাধিতে উড়িছে আজ।
গৈরিক কহে ত্যাগের মন্ত্র বৈরাগ্যের বাণী
সত্য-শান্তি প্রচারিল শ্বেত, শ্যামলে শক্তি জানি।
অশোকচক্র ধর্ম-প্রতীক, মৈত্র—করুণা—প্রীতি
প্রচারে বিশ্বে যুগ যুগ ধরি মহামিলনের গীতি।
ভারতের সব জাতি ও শ্রেণীর ব্যবধানে মহাসেতু
ভবনে ভবনে গগনে পবনে উড়িছে জাতীয় কেতু ॥

The glory of the national flag a
significance of its different colour
sign have been narrated in a
manner suitable to the young boy
girls.

অনুশীলনী

১। 'জাতীয় পতাকা' কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। জাতীয় পতাকার কয়টি রং বল। প্রত্যেকটির রঙের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৩। "এ মহা-নিশান জনকল্যাণ সাধিতে উড়িছে আজ।" কোন্ 'মহা-নিশানের' কথা বলা হইয়াছে? এই নিশানকে কবি জনকল্যাণকর বলিয়াছেন কেন?

৪। বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর :—

(ক) 'প্রাণ দিলো কত ···হ'তে নাহি পড়ে।'

(খ) 'সত্য-শান্তি...শক্তি জানি।'

(গ) 'ভারতের...জাতীয় কেতু।

৫। অর্থ লিখ ও বাক্য রচনা কর :—

জনতা : লাঞ্ছিত : কারায় ; লাজ , বৈরাগ্য।

৬। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, ভারতের জাতীয় পতাকার অশোকচক্র সম্বন্ধে কবি 'মৈত্রী-করুণা-প্রীতি'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উপরোক্ত তিনটি স্থূলাকার শব্দ লইয়া বাক্য রচনা কর।

নকল গড়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"জলস্পর্শ করব না আর" চিতোর রাণার পণ—
"বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে থাকবে যতক্ষণ।"
"কি প্রতিজ্ঞা হায় মহারাজ,
মানুষের যা' অসাধ্য কাজ,
কেমন করে সাধবে তা আজ" কহেণ মন্ত্রিগণ;
কহেন রাজা, সাধ্য না হয়, সাধব্ আমার পণ।"
বুঁদির কেল্লা চিতোর হতে, যোজন তিনেক দূর;
সেথায় হারাবংশী সবাই মহা-মহা শূর।
হামু রাজা দিচ্ছে হানা
ভয় কারে কয় নেইক জানা,
তাহার সদ্য প্রমাণ রাণা পেয়েছেন প্রচুর।
হারাবংশীর কেল্লা বুঁদি যোজন তিনেক দূর।
মন্ত্রী কহে যুক্তি করি'—"আজকে সারারাতি,
মাটি দিয়ে বুঁদির মত নকল কেল্লা পাতি'।
রাজা এসে আপন করে
দিবেন ভেঙ্গে ধূলির' পরে;
নইলে শুধু কথার তরে হবেন আত্মঘাতী?"
মন্ত্রী দিল চিতোর মাঝে নকল কেল্লা পাতি'।
কুম্ভ ছিল রাণার ভৃত্য হারাবংশী বীর,

হরিণ মেরে আস্‌ছে ফিরে, স্কন্ধে ধনু তীর
খবর পেয়ে কহে—"কে রে
নকল বুঁদি কেল্লা মেরে
হারাবংশী রাজপুতের করবে নতশির ?
নকল বুঁদি রাখ্‌ব আমি হারাবংশী বীর।"
মাটির কেল্লা ভাঙ্‌তে আসেন, রাণা মহারাজ ।
"দূরে রহ"– কহে কুম্ভ গর্জে যেন বাজ।
"বুঁদির নামে করবে খেলা,
সইব না সে অবহেলা,
নকলগড়ের মাটির ঢেলা রাখ্‌ব আমি আজ।"
কহে কুম্ভ—"দূরে রহ রাণা মহারাজ।"
ভূমির 'পরে জানু পাতি' তুলি' ধনুঃশর,
একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড় ।
রাণার সেনা ঘিরে তারে ,
মুন্ড কাটে তরবারে,
খেলাগড়ের সিংহদ্বারে পড়ল ভূমির' পর ।
রক্তে তাহার ধন্য হল নকল বুঁদিগড় ।

অনুশীলনী

১। 'নকলগড়' কবিতাটির কাহিনী সংক্ষেপে নিজ ভাষায় লিখ।
২। রাণা কুম্ভের চরিত্রটি তোমার কেমন লাগে, বল।
৩। বাক্য তৈয়ারী কর ঃ
যোজন, আত্মঘাতী, জানু, নকল, ধন্য।
৪। বিশেষ্য ও বিশেষণ পদগুলির নীচে দাগ দাও ঃ—
খেলাগড়ের সিংহদ্বারে পড়ল ভূমির 'পর ,
রক্তে তাহার ধন্য হ'ল নকল বুঁদিগড়।

A patriotic Poem. Motherland is